আল-উম্মাহ

মাসিক জার্নাল ■ বর্ষ ১ ■ সংখ্যা ১ ■ মে ২০২৬
www.al-ummah.org

নোংরা যুদ্ধ ও বিশ্ব ব্যবস্থার পতন

বাংলাদেশের অর্থনীতির কৌশলগত পুনর্বিন্যাস

দুই সভ্যতার সঙ্ঘাত ও সমঝোতার প্রশ্ন

বৈশ্বিক হুমকি : ইসলাম এবং উম্মাহর করণীয়

আল-উম্মাহ
www.al-ummah.org

প্রবন্ধ জমাদানের নির্দেশিকা

আল-উম্মাহ এমন সু-লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানায় যা গভীরতা, স্পষ্টতা এবং বিশ্লেষণধর্মী দৃঢ়তা প্রদর্শন করে। প্রবন্ধে বিষয়বস্তুর প্রাসঙ্গিকতা সম্পর্কে সুসংগঠিত বিশ্লেষণ ও শক্তিশালী প্রেক্ষাপটগত বোঝাপড়া থাকতে হবে। আমরা বৈশ্বিক ভূরাজনীতি, মুসলিম বিশ্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন, ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি, এবং বিস্তৃত সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত রূপান্তর নিয়ে অবদান আহ্বান করি। জমা দেওয়ার আগে অনুগ্রহ করে নিম্নলিখিত শর্তাবলী লক্ষ্য করুন:

- প্রবন্ধটি ১,০০০ থেকে ১,৩০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে এবং পরিষ্কার ও পরিমার্জিত বাংলায় লেখা থাকতে হবে।
- এতে যুক্তিসংগতভাবে উপস্থাপিত মতামত থাকতে হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ দ্বারা সমর্থিত হতে হবে।
- এটি অবশ্যই মৌলিক এবং পূর্বে অপ্রকাশিত হতে হবে। তথ্যের যথার্থতা, যথাযথ সূত্র প্রদান এবং বৌদ্ধিক সততা বজায় রাখার দায়িত্ব লেখকের।
- জমা দেওয়া সকল লেখা সম্পাদকীয় পর্যালোচনার আওতায় যাবে।
- স্পষ্টতা, শৈলী এবং দৈর্ঘ্যের জন্য প্রবন্ধ সম্পাদনার অধিকার আল-উম্মাহ সংরক্ষণ করে।
- প্রকাশ নিশ্চিত নয়।
- জমা দেওয়ার সময় লেখকের পূর্ণ নাম এবং সংক্ষিপ্ত জীবনী অন্তর্ভুক্ত করুন।
- জমা পাঠানোর ঠিকানা: info@al-ummah.org

কপিরাইট নোটিশ

আল-উম্মাহ ওয়েবসাইট এবং এর মুদ্রিত ও ডিজিটাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত সকল প্রবন্ধ ও বিষয়বস্তু প্রযোজ্য কপিরাইট আইনের আওতায় সুরক্ষিত এবং আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের বৌদ্ধিক সম্পত্তি হিসেবে সংরক্ষিত।

অন্যথা উল্লেখ না থাকলে, এই প্রকাশনার কোনো অংশ পূর্ব লিখিত অনুমতি ছাড়া পুনরুৎপাদন, সংরক্ষণ, বা কোনোভাবে প্রেরণ করা যাবে না– তা ইলেকট্রনিক, যান্ত্রিক, ফটোকপি, রেকর্ডিং বা অন্য যেকোনো মাধ্যমে হোক না কেন।

লেখা জমা দেওয়ার মাধ্যমে লেখক স্বীকার ও সম্মত হন যে, গ্রহণ ও প্রকাশের পর প্রকাশিত উপাদানের কপিরাইট আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশনের অধীনে থাকবে। পৃথক প্রবন্ধে প্রকাশিত মতামত সংশ্লিষ্ট লেখকের নিজস্ব এবং তা ফাউন্ডেশনের মতামতের সঙ্গে আবশ্যিকভাবে মিল নাও থাকতে পারে।

স ম্পা দ কী য়

পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক ব্যবস্থায় জাতি ও বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার পুনর্গঠন

আজকের বিশ্ব এক গভীর ও বহুমাত্রিক রূপান্তরের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করছে–যার প্রভাব সুদূরপ্রসারী। প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, অর্থনৈতিক অস্থিরতা, জলবায়ু সংকট এবং সামাজিক টানাপোড়েন মিলিতভাবে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটকে নতুনভাবে নির্মাণ করছে। বিশেষত শাসনব্যবস্থা ও বাজার কাঠামোয় এই পরিবর্তনের অভিঘাত বৈশ্বিক ভারসাম্যকে পুনর্গঠিত করছে। আঞ্চলিক সজ্ঘাত ও আর্থিক অনিশ্চয়তা এই বাস্তবতাকে আরও জটিল করে তুলছে। এমন এক পরিবর্তনশীল প্রেক্ষাপটে মুসলিম বিশ্বে বুদ্ধিবৃত্তিক পুনর্জাগরণের প্রয়োজনীয়তা ক্রমেই তীব্র হয়ে উঠছে–যা কেবল নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রেই নয়, বরং আধুনিকতার জটিল প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানেরও অপরিহার্য মাধ্যম। এই প্রয়াসের অংশ হিসেবেই "আল-উম্মাহ" একটি বিনয়ী কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ উদ্যোগ।

জার্নালটির লক্ষ্য হলো গভীরতা, প্রেক্ষাপট ও বিশ্লেষণধর্মী কঠোরতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মুসলিম সমাজ ও বৈশ্বিক ভূ-রাজনীতিকে ঘিরে অর্থবহ আলোচনার জন্য একটি কার্যকর প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলা। এটি কেবল সমস্যার বর্ণনা নয়, বরং অনিশ্চয়তার ভেতরে পথ খোঁজার একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্রয়াস।

'আল-উম্মাহ' এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি ধারণ করে, যা চিন্তাশীল সংলাপকে উৎসাহিত করে এবং মর্যাদা, সহাবস্থান ও সভ্যতার অগ্রগতিকে এগিয়ে নিতে চায়। এর ভিত্তি এই বিশ্বাসে নিহিত–বিশ্ব পরিবর্তনের দাবি নয়, বরং চিন্তার উৎকর্ষই প্রকৃত পরিবর্তনের সূচনা ঘটায়।

এই জার্নালের বৌদ্ধিক কাঠামো অন্তর্ভুক্তিমূলকতা ও বৈশ্বিক সংলাপের ওপর প্রতিষ্ঠিত। ইংরেজি, আরবি, বাংলা ও তুর্কি–এই চার ভাষায় প্রকাশনার মাধ্যমে এটি ভাষা ও ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করতে চায়। এই বহুভাষিক উদ্যোগ বিভিন্ন মুসলিম সমাজের মধ্যে যোগাযোগের সেতুবন্ধন তৈরি করে এবং বৃহত্তর পাঠকসমাজকে সম্পৃক্ত করে। পাশাপাশি, বিভিন্ন অঞ্চল ও মতাদর্শের গবেষক, সাংবাদিক ও নীতিনির্ধারকদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে এটি বহুমাত্রিক মতবিনিময়ের একটি মুক্ত বুদ্ধিবৃত্তিক পরিসর গড়ে তুলতে সচেষ্ট।

'আল-উম্মাহ'-এর আলোচ্য বিষয়বস্তু বহুশাস্ত্রীয় ও বিস্তৃত। বৈশ্বিক শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বিতা, মানবিক সংকট ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নৈতিকতার প্রশ্ন যেমন গুরুত্ব পাবে, তেমনি ইসলামী চিন্তাধারার ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রাসঙ্গিকতাও আলোচনায় স্থান পাবে। অর্থনীতি বিষয়ে প্রবন্ধগুলো টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের পথ অনুসন্ধান করবে।

যুবসমাজ, শিক্ষা, ইসলামী মনোবিজ্ঞান ও মানবাধিকার নিয়ে লেখা মানব উন্নয়নের গভীরতর উপলব্ধিকে সমৃদ্ধ করবে। একই সঙ্গে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ও উদীয়মান প্রযুক্তি নিয়ে বিশ্লেষণ ভবিষ্যতের উদ্ভাবন ও নৈতিকতার সম্পর্ক নিয়ে নতুন ভাবনার দুয়ার খুলবে। সাংস্কৃতিক পরিসরে ইসলামী শিল্প-ঐতিহ্য ও সৃজনশীলতার গুরুত্ব তুলে ধরা হবে পরিচয় নির্মাণের অংশ হিসেবে।

সম্পাদকীয় নীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মতভেদের প্রতি উন্মুক্ততা। ভিন্নমতকে স্বাগত জানিয়ে এবং যুক্তিনির্ভর আলোচনাকে অগ্রাধিকার দিয়ে জার্নালটি মতাদর্শগত একরৈখিকতার পরিবর্তে গঠনমূলক সংলাপকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। অভিজ্ঞ সম্পাদকীয় বোর্ড তথ্যভিত্তিক বিশ্লেষণ, নৈতিক সাংবাদিকতা এবং স্পষ্ট ভাষা ব্যবহারের মাধ্যমে আস্থা ও বিশ্বাসযোগ্যতা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

দ্রুত পরিবর্তনশীল তথ্যপ্রবাহ ও খণ্ডিত বয়ানের এই যুগে বিশ্লেষণভিত্তিক প্ল্যাটফর্মের গুরুত্ব অপরিসীম। সেই বাস্তবতা বিবেচনায় 'আল-উম্মাহ' একটি সচেতন বুদ্ধিবৃত্তিক উদ্যোগযথা জ্ঞানচর্চা, ভারসাম্যপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি এবং ন্যায়ভিত্তিক চিন্তার প্রসারে অবদান রাখতে চায়।

জার্নালটি কেবল একটি মুদ্রিত প্রকাশনা নয়; এটি একটি সমন্বিত বুদ্ধিবৃত্তিক প্ল্যাটফর্ম–যেখানে মুদ্রণ, ডিজিটাল মাধ্যম, পডকাস্ট, নিউজলেটার ও মোবাইল অ্যাপ একত্রে জ্ঞান বিনিময়ের একটি গতিশীল পরিসর গড়ে তুলেছে।

প্রধান সম্পাদক

আল-উম্মাহ

মা সি ক জা র্না ল

প্রধান সম্পাদক
মোহাম্মদ জাকির হোসেন

ব্যবস্থাপনা সম্পাদক
মাসুমুর রহমান খলিলী

বর্ষ ১ | মে ২০২৬ | সংখ্যা ১

আল-উম্মাহ : মুসলিম বিশ্বকে পরিবর্তন করার একটি উদ্যোগ পৃ. ৪

দুই সভ্যতার সজ্ঘাত ও সমঝোতার প্রশ্ন ৮

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: বাস্তবতা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয় ১৭

শিক্ষাসংস্কারের উপযুক্ত সময় এখনই ১৯

নোংরা যুদ্ধ ও বিশ্ব ব্যবস্থার পতন ২৮

বৈশ্বিক হুমকি : ইসলাম এবং উম্মাহর করণীয় ৩২

অং সান সু চি ও তার নীরবতার মাশুল ৩৬

এপস্টাইন ফাইলস : যেভাবে পাশ্চাত্যের নৈতিক মুখোশ ধসে পড়েছে ৪১

সৃজনশীল চিন্তায় ইবনে খালদুনের শিক্ষা ৪৪

মোড় পরিবর্তন: বাংলাদেশের অর্থনীতির কৌশলগত পুর্নবিন্যাস ৪৮

হরমুজ সংকট : ইরান-যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্ব ও বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকি পৃ. ১৪

আল-উম্মাহ, একটি মাসিক জার্নাল, বাংলাদেশের ঢাকায় অবস্থিত ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশন থেকে প্রকাশিত হয়। এটি ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় পাওয়া যায়। প্রিয় লেখকবৃন্দ, আপনারা সমসাময়িক বিষয়াবলী, ইসলামী বিজ্ঞান, বুদ্ধিবৃত্তিক গবেষণা, ইতিহাস, এবং জননীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রবন্ধ জমা দিতে পারেন। আমরা ইংরেজি, আরবি, বাংলা এবং তুর্কি ভাষায় ১৩০০ শব্দের অনধিক মৌলিক ও পরিচ্ছন্নভাবে লিখিত প্রবন্ধকে স্বাগত জানাই। প্রবন্ধ পাঠানোর ঠিকানা:
info@al-ummah.org
www.al-ummah.org

مؤسسة الأمة
AL-UMMAH FOUNDATION

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনস (বিআইসিআরডি)
ঢাকা, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক কৌশল পৃ. ২২

বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে তরুণ মেধা লালন ৫০

ইসলাম ও মানবাধিকার : সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সাথে অভিন্ন যোগসূত্র ৫২

ইসলামি মনোবিজ্ঞান : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা ৫৪

প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেল ও দারিদ্র্য বিমোচনে এর অসামঞ্জস্যতা ৫৬

আধুনিক বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা ৫৯

ইস্তাম্বুল: ইতিহাস, সভ্যতা ও ধর্মীয়-আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য নগরী ৬২

হুসন-ই হাত-এর শিল্পকলা : ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস ৬৫

ফিলিস্তিন ও আমাদের করণীয় ৬৯

মতবিরোধ থেকে ঐক্যে: বাংলাদেশে ধর্মীয় উত্তেজনা নিরসনের একটি রূপকল্প ৭১

জবাবদিহিহীন মানবাধিকার : কাশ্মির এবং বিশ্ববিবেকের ব্যর্থতা পৃ. ৩৮

প্রতিবেদক

মোহাম্মদ জাকির হোসেন

আবুল আসাদ

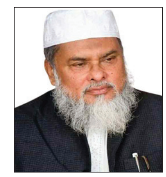
আ ফ ম খালিদ হোসেন, পিএইচডি

আবু বকর রফীক আহমদ, পিএইচডি

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, পিএইচডি

মোহাম্মদ কবির হাসান, পিএইচডি

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ

মোহাম্মদ নুরুল আমিন

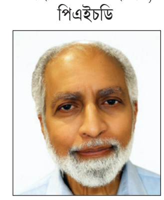
জাভেদ আকবর

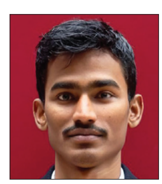
আবুল কাসেম

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি

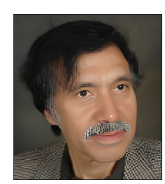
মাহমুদ ধাওয়াদি

মাসুমুর রহমান খলিলী

কর্নেল আশরাফ আল দীন

সাজাদ আহমদ পান্দাই, পিএইচডি

এন এস এম রেজাউর রহমান

মোঃ সালাহউদ্দিন, পিএইচডি

আহমেত কুতলুহান

আল-উম্মাহ : মুসলিম বিশ্বকে পরিবর্তন করার একটি উদ্যোগ

মোহাম্মদ জাকির হোসেন
চেয়ারম্যান, আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন
প্রধান সম্পাদক, আল-উম্মাহ

আল-উম্মাহ একটি প্ল্যাটফর্ম, যা কঠোর বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পৃক্ততা এবং নীতিগত বিশ্লেষণের মাধ্যমে মুসলিম সমাজকে ক্ষমতায়িত করতে চায়।

বিশ্ব এক গভীর কাঠামোগত পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। অর্থনৈতিক প্রভাব ক্রমাগত প্রথাগত পশ্চিমা শক্তিগুলোর কাছ থেকে গ্লোবাল সাউথের উদীয়মান অর্থনীতির দিকে সরে যাচ্ছে। প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রগতি বাজার এবং শাসনব্যবস্থাকে নতুন রূপ দিচ্ছে। বৃহৎ শক্তিগুলোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা, আর্থিক অস্থিরতা, আঞ্চলিক সজ্ঘাত, জলবায়ু পরিবর্তনজনিত চাপ এবং সামাজিক রূপান্তর বৈশ্বিক ব্যবস্থার কাঠামোকে নতুন করে সংজ্ঞায়িত করছে।

তবুও এই পরিবর্তনগুলো ব্যাখ্যা করার জন্য ব্যবহৃত বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোর বড় অংশই নির্দিষ্ট কিছু প্রতিষ্ঠান এবং দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। বৈশ্বিক ক্ষমতার ভারসাম্য যেভাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তাতে আরো

বিস্তৃত বিশ্লেষণধর্মী কণ্ঠস্বরের–বিশেষ করে মুসলিম-প্রধান সমাজগুলো থেকে–প্রয়োজনীয়তা এখন জরুরি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই রূপান্তরের প্রেক্ষাপটেই 'আল-উম্মাহ'র আত্মপ্রকাশ : একটি নতুন বহুভাষিক বৈশ্বিক বিষয়াবলি সংক্রান্ত ওয়েবসাইট এবং সাময়িকী, যা মুসলিম সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে গভীর, নীতি-নির্ধারণী এবং তথ্য-প্রমাণ ভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রদানের জন্য ডিজাইন করা হয়েছে।

পরিবর্তনশীল বিশ্বের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম

আল-উম্মাহ ফাউন্ডেশন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এবং ইসলামিক সেন্টার ফর রিসার্চ অ্যান্ড ডকুমেন্টেশনের সাথে যুক্ত 'আল-উম্মাহ' কেবল একটি প্রকাশনা হিসেবে নয়, বরং এর চেয়েও বড় কিছু হিসেবে পরিকল্পিত। গতি, মেরুকরণ এবং খণ্ডিত মন্তব্যের এই যুগে গভীরতা, নির্ভুলতা এবং নীতিগত প্রতিফলন পুনরুদ্ধারে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একটি বুদ্ধিবৃত্তিক প্ল্যাটফর্ম এটি।

আমরা এক তথ্যের প্লাবনের যুগে অর্থাৎ তথ্যের ভিড়ে ডুবে থাকা এক সময়ে বাস করছি। জনমত বা গণবিতর্ক প্রায়ই চিন্তাশীলতার চেয়ে তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ার মাধ্যমে এবং গবেষণার চেয়ে বাগাড়ম্বরের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। আল-উম্মাহ সচেতনভাবে সেই স্রোতের বিপরীতে হাঁটতে চায়। এটি সুশৃঙ্খল বিশ্লেষণ, ঐতিহাসিক সচেতনতা এবং বাস্তবধর্মী দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত। এটি মতাদর্শের চেয়ে তথ্য-প্রমাণকে এবং উত্তেজনা ছড়ানোর চেয়ে স্বচ্ছতাকে প্রাধান্য দেয়।

মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক মিলনস্থল

বিশ্বব্যাপী মুসলিম উম্মাহ ১৮০ কোটিরও বেশি মানুষের এক বিশাল জনগোষ্ঠী। বিশ্বজুড়ে যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে, তাতে মুসলিম-প্রধান সমাজগুলো কোনো প্রান্তিক শক্তি নয়; বরং তারা এর কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের ভূ-রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে শুরু করে দক্ষিণ এশিয়ার গণতান্ত্রিক উত্তরণ, লোহিত সাগরের সামুদ্রিক প্রতিযোগিতা থেকে শুরু করে ইউরোপের অভিবাসন বিতর্ক–সবখানেই মুসলিম সমাজগুলো বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

তবুও এমন প্ল্যাটফর্ম খুব কমই আছে যা একইসাথে প্রাতিষ্ঠানিক গভীরতা, বাস্তবসম্মত নীতি এবং প্রকৃত অর্থে মুসলিম বিশ্বের একটি বৈশ্বিক দৃষ্টিভঙ্গিকে তুলে ধরতে পারে।

আল-উম্মাহ জ্ঞান, ন্যায়পরায়ণতা এবং কৌশলগত গভীরতার ওপর ভিত্তি করে একটি প্ল্যাটফর্ম তৈরির মাধ্যমে এই অভাব পূরণ করতে চায়। বর্তমানের এই খণ্ডিত বা অগোছালো সময়ে আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি বোঝার জন্য পাঠকদের একটি সুসংগত কাঠামো প্রদান করাই এর লক্ষ্য। একই সাথে এটি নীতি-নির্ধারণী জ্ঞান এবং বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধিতেও কাজ করে।

মুসলিম সমাজগুলোর জন্য এমন এক নির্ভরযোগ্য, স্বাধীন ও আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক কণ্ঠস্বর প্রয়োজন, যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিশ্ব পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে। এটি কেবল তথ্য নয়, বরং বিষয়ের গভীরে গিয়ে বোঝাপড়া তৈরি করতে চায়; এটি কেবল মতামত নয়, বরং একটি চিন্তার কাঠামো দিতে চায়; এটি কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং কৌশলগত দূরদৃষ্টি প্রদান করতে চায়

নেতৃত্ব এবং প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরযোগ্যতা

এই উদ্যোগের নেতৃত্বে আছেন প্রবীণ সাংবাদিক ও গবেষক মোহাম্মদ জাকির হোসেন। তার পেশাদার অভিজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে মক্কার 'রাবিতা ইংরেজি জার্নাল' এবং ইস্তাম্বুলের 'ডেইলি সাবাহ'-তে সম্পাদকীয় কাজ। পণ্ডিত ব্যক্তি, গণমাধ্যম ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত একটি ট্রাস্টি বোর্ড এই প্ল্যাটফর্মটি তত্ত্বাবধান করে, যা এর প্রাতিষ্ঠানিক নির্ভরযোগ্যতা এবং সম্পাদকীয় স্বাধীনতা নিশ্চিত করে।

'আল-উম্মাহ' ইংরেজি, বাংলা, আরবি এবং তুর্কি—এই চারটি ভাষায় প্রতি মাসে প্রকাশিত হবে, যা ভাষাগত ও ভৌগোলিক দূরত্ব ঘুচিয়ে দেবে। শুরুতে এটি ডিজিটাল মাধ্যমে থাকলেও ভবিষ্যতে এর ছাপানো সংস্করণ বের করার পরিকল্পনা রয়েছে। প্রতিটি সংখ্যায় দীর্ঘ গবেষণা, নীতি-নির্ধারণী ব্রিফিং, বিশ্লেষণধর্মী প্রবন্ধ এবং তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক প্রতিবেদন থাকবে।

সম্পাদনা দর্শন : খণ্ডবিখণ্ডিত তথ্যের বদলে কাঠামোগত বিশ্লেষণ

আল-উম্মাহ'র সম্পাদনা দর্শন অত্যন্ত স্পষ্ট :

- মতাদর্শের চেয়ে তথ্য-প্রমাণকে গুরুত্ব দেয়া।
- বিচ্ছিন্ন মন্তব্যের বদলে সুসংগত বা গোছানো বিশ্লেষণ।
- সাময়িক খবরের বদলে প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকে প্রাধান্য দেয়া।
- বিচ্ছিন্ন ঘটনার বদলে দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত ধারা পর্যবেক্ষণ করা।

প্রতিটি সংখ্যায় কোনো একটি বড় ভূ-রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক পরিবর্তনের ওপর গবেষণানির্ভর বিশেষ বিশ্লেষণ থাকবে। এই অনুসন্ধানগুলো কেবল ওপর ওপর বর্ণনা করবে না; বরং টাইমলাইন, মানচিত্র, চার্ট এবং তুলনামূলক তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করে এর কৌশলগত প্রভাবগুলো পরিষ্কারভাবে তুলে ধরবে—বিশেষ করে বৈশ্বিক পরিবর্তনের এই সময়ে মুসলিম সমাজগুলোর ওপর এর প্রভাব কেমন হতে পারে, সেদিকেই নজর দেওয়া হবে।

প্রতিটি সংখ্যায় আরো থাকবে :

- গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ঘটনাবলির একটি বৈশ্বিক সারসংক্ষেপ।
- নীতি-নির্ধারণী সম্পাদকীয়, যা প্রাতিষ্ঠানিক সুচিন্তিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরবে।
- অর্থনৈতিক, নিরাপত্তা এবং কূটনৈতিক ধারার তথ্য-উপাত্ত ভিত্তিক বিশ্লেষণ।

প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহ

মধ্যপ্রাচ্য: কৌশলগত পুনর্গঠন এবং নিরাপত্তা পরিস্থিতি

আল-উম্মাহ বিভিন্ন রাষ্ট্রের পরিবর্তিত সম্পর্ক, উপসাগরীয় অঞ্চলের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, সমুদ্রপথ, বাণিজ্য করিডোর, জ্বালানি নিরাপত্তা এবং প্রক্সি যুদ্ধ (পরোক্ষ সজ্ঘাত) নিয়ে বিশ্লেষণ করবে। বৃহৎ শক্তিগুলোর মধ্যেকার প্রতিযোগিতা কীভাবে মধ্যপ্রাচ্যের জোট গঠন এবং আর্থিক স্থিতিশীলতাকে নতুন রূপ দিচ্ছে, তাও এখানে খতিয়ে দেখা হবে।

ফিলিস্তিন ইস্যুটির ওপর এখানে নিয়মিত এবং নীতিগত গুরুত্ব দেওয়া হবে। কেবল মাঝেমধ্যে ঘটা বিচ্ছিন্ন খবর প্রচার না করে, এই সাময়িকীটি মানবিক বাস্তবতার সাথে আইনি বিশ্লেষণ, কূটনৈতিক উদ্যোগ এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটকে যুক্ত করবে। এর লক্ষ্য হলো ফিলিস্তিন সঙ্কটের কৌশলগত দিকগুলো এবং আন্তর্জাতিক আইন ও মুসলিম রাজনৈতিক চেতনার ওপর এর প্রভাবগুলো স্পষ্টভাবে তুলে ধরা।

দক্ষিণ এশিয়া : গণতন্ত্র, নির্বাচন এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা

বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের নির্বাচন কেবল তাদের নিজেদের সীমানার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, বরং এর প্রভাব অনেক গভীরে। এই নির্বাচনগুলো পররাষ্ট্রনীতি, সংখ্যালঘু অধিকার, অর্থনৈতিক অবস্থা এবং আঞ্চলিক পানিবণ্টন ব্যবস্থাপনাকে প্রভাবিত করে। অভিন্ন নদ-নদী, জনসংখ্যার চাপ এবং জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি এই অঞ্চলের ভূ-রাজনৈতিক হিসাব-নিকাশকে প্রতিনিয়ত নতুন রূপ দিচ্ছে। আল-উম্মাহ তথ্যনির্ভর এবং তুলনামূলক বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলো তুলে ধরবে।

তুর্কি এবং কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন

ইউরোপ, মধ্য এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের সংযোগস্থলে

অবস্থিত হওয়ায় বিশ্বশক্তির পুনর্গঠনে তুরস্ক এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ন্যাটোর সদস্যপদ রক্ষা করা, আঞ্চলিক বিবাদ মেটানো, বাণিজ্যের প্রসার এবং নিজস্ব নীতি বজায় রাখার মাধ্যমে তুরস্ক যে কূটনৈতিক ভারসাম্য বজায় রেখে চলছে–তা বিশ্বব্যবস্থার বড় ধরনের কাঠামোগত পরিবর্তনেরই প্রতিফলন।

তুরস্কের নীতিগুলো কীভাবে বৈশ্বিক পরিবর্তনের সাথে খাপ খাচ্ছে এবং মুসলিম প্রধান দেশগুলোর ওপর এর প্রভাব কেমন হচ্ছে, 'আল-উম্মাহ' তা নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে।

আফ্রিকা এবং কৌশলগত সামুদ্রিক প্রতিযোগিতা

আফ্রিকা মহাদেশজুড়ে সাহেল অঞ্চল, লোহিত সাগরের সামুদ্রিক পথ এবং সেখানে বাইরের শক্তিগুলোর ক্রমবর্ধমান উপস্থিতির ওপর বিশেষ নজর দেওয়া হবে। এই সাময়িকীটি ওই অঞ্চলের সরকারগুলোর জন্য স্থিতিশীলতা, সার্বভৌমত্ব এবং টেকসই উন্নয়নের ক্ষেত্রে কী কী নীতিগত বিকল্প বা পথ খোলা আছে, তা মূল্যায়ন করবে।

পাশ্চাত্যের নীতি ও বৈশ্বিক প্রভাব

পাশ্চাত্য ও ইউরোপীয় দেশগুলোর নীতিগত বিতর্ক–যেমন নিষেধাজ্ঞার ধরণ, জোটের বিস্তার, অভিবাসন ব্যবস্থাপনা এবং উদীয়মান শক্তিগুলোর সাথে তাদের সম্পৃক্ততা–মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোর ওপর গভীর প্রভাব ফেলে। আল-উম্মাহ বিশ্লেষণ করবে কীভাবে এই সিদ্ধান্তগুলো আর্থিক বাজার, কূটনৈতিক মেরুকরণ এবং দেশীয় নীতি নির্ধারণকে প্রভাবিত করছে।

ব্যবসা, উন্নয়ন ও পরিবেশ

ভূ-রাজনীতির বাইরেও, আল-উম্মাহ নিচের বিষয়গুলোর জন্য আলাদা বিভাগ রাখবে :

- ইসলামি অর্থব্যবস্থা এবং বাণিজ্য করিডোর
- জ্বালানি রূপান্তর এবং সামষ্টিক অর্থনৈতিক ধারা
- নিষেধাজ্ঞা ব্যবস্থা এবং পারমাণবিক আলোচনা
- জলবায়ু পরিবর্তন, পানির অভাব এবং খাদ্যনিরাপত্তাহীনতা

পরিবেশগত চাপ–সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি থেকে শুরু করে মরুভূমিকরণ–বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের অভিবাসন এবং অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতাকে বদলে দিচ্ছে। ভূ-রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আলোচনার সাথে পরিবেশগত বিশ্লেষণকে যুক্ত করার মাধ্যমে 'আল-উম্মাহ' একটি দায়িত্বশীল ও দূরদর্শী নীতি প্রণয়নকে উৎসাহিত করতে চায়।

বুদ্ধিবৃত্তিক এবং সাংস্কৃতিক নবজাগরণ

একটি বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক বিভাগ আধুনিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার সাথে ইসলামের বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যকে যুক্ত করবে। বই পর্যালোচনা, সাক্ষাৎকার, প্রবন্ধ এবং ঐতিহাসিক

আল-উম্মাহ জার্নালের সম্পাদকীয় বোর্ডের সদস্যরা, যাঁদের মধ্যে বোর্ডের চেয়ারম্যান ও প্রধান সম্পাদক মোহাম্মদ জাকির হোসেন (বামে উপবিষ্ট) রয়েছেন, জার্নালের বিষয়বস্তু নীতি ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা করছেন। আরও উপস্থিত রয়েছেন ডেইলি সাবাহ'র ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বাতুহান তাকিস, আরবি বিভাগের ব্যবস্থাপনা সম্পাদক ইসাম শেহদাত ও প্রখ্যাত ওয়েব ডিজাইনার রাহমী ওসমান।

পর্যালোচনার মাধ্যমে এই সাময়িকীটি বিভিন্ন দার্শনিক ধারার মধ্যে গঠনমূলক আলোচনাকে উৎসাহিত করবে। এর লক্ষ্য কেবল তথ্য দেওয়া নয়, বরং বিশ্লেষণাত্মক চিন্তাভাবনা এবং নৈতিক বোধ তৈরি করা।

বৈশ্বিক রূপান্তরের মাঝে একটি বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর

এখনকার সংবাদমাধ্যমগুলো কেবল দ্রুত খবর দেয়া, উত্তেজনা ছড়ানো আর একে অপরের বিরুদ্ধে উস্কানি দেয়ার প্রতিযোগিতায় মেতেছে। এমন সময়ে গভীর এবং তথ্যনির্ভর বিশ্লেষণ পাওয়াই দায়। 'আল-উম্মাহ' সচেতনভাবেই এই ধারার বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়।

এর মূল ভিত্তি বা উদ্দেশ্য একদম স্পষ্ট : মুসলিম সমাজগুলোর জন্য এমন এক নির্ভরযোগ্য, স্বাধীন ও আধুনিক বুদ্ধিবৃত্তিক কণ্ঠস্বর প্রয়োজন, যা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে বিশ্ব পরিস্থিতিকে বিশ্লেষণ করতে পারবে এবং দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে।

'আল-উম্মাহ' বিশ্বের প্রথম সারির নীতিনির্ধারণী প্রকাশনাগুলোর মধ্যে জায়গা করে নিতে পারবে কি না, তা নির্ভর করবে এর বুদ্ধিবৃত্তিক স্বাধীনতা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সততার ওপর। তবে এর চলার পথ ও লক্ষ্য এখন একদম স্পষ্ট।

এটি কেবল তথ্য নয়, বরং বিষয়ের গভীরে গিয়ে বোঝাপড়া তৈরি করতে চায়; এটি কেবল মতামত নয়, বরং একটি চিন্তার কাঠামো দিতে চায়; এটি কেবল তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া নয়, বরং কৌশলগত দূরদৃষ্টি প্রদান করতে চায়। দিনশেষে, 'আল-উম্মাহ' হলো এক পরিবর্তনশীল বিশ্বের কণ্ঠস্বর–যা জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত, স্বচ্ছতার প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ এবং ভবিষ্যতের দিকে ধাবিত। ■

দুই সভ্যতার সঙ্ঘাত ও সমঝোতার প্রশ্ন

আবুল আসাদ
সিনিয়র সম্পাদক
লেখক ও গবেষক

এক.

বর্তমানে এই বিশ্বাসটি অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে যে, কমিউনিজমের পতনের ফলে দীর্ঘস্থায়ী 'স্নায়ুযুদ্ধ' (Cold War) শেষ হলেও সঙ্ঘাতের অবসান ঘটেনি। মার্কিন নেতৃত্বাধীন বিজয়ী পশ্চিমা শক্তি এখন ইসলামকে তাদের নতুন লক্ষ্যবস্তু (Target) হিসেবে গ্রহণ করেছে। ফলে এক সময় কমিউনিজমের সাথে পশ্চিমের যে দ্বন্দ্ব ছিল, আজ সেই একই সঙ্ঘাতের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে ইসলাম। এই ধারণা কেবল মুসলিম বিশ্বের একার নয়, বরং পশ্চিমা বিশ্বের অনেক প্রখ্যাত চিন্তাবিদও অনুরূপ মত পোষণ করছেন।

হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটির 'জন এম. অলিন ইনস্টিটিউট ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ'-এর পরিচালক ও প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী স্যামুয়েল হান্টিংটন তার বিখ্যাত নিবন্ধ 'The Clash of Civilizations' (সভ্যতার সঙ্ঘাত)-এ বিশ্ব সঙ্ঘাতের ইতিহাস বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, আধুনিক যুগের সর্বশেষ সঙ্ঘাতটি হবে বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে। বিশেষ করে, পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্গে ইসলামী সভ্যতার সঙ্ঘাতই

হবে এর মূল কেন্দ্রবিন্দু।

স্যামুয়েল হান্টিংটন তার এই তত্ত্বের পক্ষে বেশ কিছু জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেছেন:

১. সভ্যতার সচেতনতা: বিভিন্ন সভ্যতার মধ্যে বর্তমানে নানামুখী বিতর্ক বাড়ছে। এর ফলে স্ব-স্ব সভ্যতা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা শেষ পর্যন্ত আন্তঃসভ্যতা বৈচিত্র্য ও বিরোধের ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করছে।

২. দীর্ঘস্থায়ী সাংস্কৃতিক বিভাজন: তার মতে, পশ্চিমা ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে প্রায় তেরশ বছর ধরে সজ্ঘাত বিদ্যমান। ইউরোপের অভ্যন্তরীণ আদর্শিক বিভাজন ও বিরোধ মিটে যাওয়ার পর তাদের সেই পুরনো সাংস্কৃতিক ভিন্নতা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে।

৩. ঐতিহাসিক সামরিক সজ্ঘাত: হান্টিংটন মনে করেন, ইসলাম ও পশ্চিমের মধ্যকার কয়েক শতাব্দীর সামরিক সজ্ঘাতের ইতিহাস মুছে যাওয়ার নয়। এটি বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও মুসলিম দেশগুলোতে পশ্চিমা-বিরোধী মনোভাবকে আরও তীব্র করে তুলছে।

৪. নতুন বিশ্ব ব্যবস্থার আকাঙ্ক্ষা: ভারতীয় সাংবাদিক এম. জে. আকবরের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, মরক্কো থেকে পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম জাতিগুলোর একটি নিজস্ব 'নতুন বিশ্ব ব্যবস্থা' গড়ে তোলার আকাঙ্ক্ষা এক অভূতপূর্ব পরিস্থিতির সৃষ্টি করছে।

৫. সাম্প্রতিক দাঙ্গা ও গৃহযুদ্ধ: যুক্তি হিসেবে তিনি সুদান ও চাদের গৃহযুদ্ধ, নাইজেরিয়া ও আফ্রিকার শৃঙ্গ (Horn of Africa)-র সজ্ঘাত, ভারতে বাবরি মসজিদ ধ্বংস কেন্দ্রিক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা, বসনিয়া ও ফিলিপাইনে খ্রিস্টানদের সাথে লড়াই এবং ফিলিস্তিনে ইহুদি ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বৌদ্ধদের সাথে মুসলমানদের দ্বন্দ্বকে উল্লেখ করেছেন।

তবে হান্টিংটনের এই 'সভ্যতার সজ্ঘাত' তত্ত্বকে পশ্চিমা বিশ্বের অনেকেই 'হাস্যকর' বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। তাদের মতে, এসব যুক্তির বাস্তব ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। এই সমালোচকদের মধ্যে তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অ্যান্থনি লেক অন্যতম প্রধান কণ্ঠস্বর।

১৯৯৪ সালের ৬ মে ওয়াশিংটনে 'ইনস্টিটিউট ফর নিয়ার ইস্ট পলিসি' আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি এই তত্ত্বকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান করে বলেন:

"আমরা ভবিষ্যতের সম্ভাব্য সজ্ঘাতকে কোনোভাবেই 'সভ্যতার সজ্ঘাত' বলে মনে করি না। কেউ কেউ বলছেন যে, স্নায়ুযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্ব মৌলিকভাবে দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছে–যেখানে পশ্চিমা উদারপন্থী গণতন্ত্রের প্রতিপক্ষ হলো ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মভিত্তিক সভ্যতা। তাদের তত্ত্ব অনুযায়ী, পশ্চিম ও অবশিষ্ট বিশ্বের মধ্যে সমঝোতার কোনো স্থান নেই এবং একমাত্র মহাশক্তি হিসেবে আমেরিকা এখন কমিউনিজমের শূন্যস্থান পূরণকারী হিসেবে ইসলামের বিরুদ্ধে 'ক্রুসেড' বা ধর্মযুদ্ধ শুরু করবে।"

অ্যান্থনি লেক এই মতের তীব্র বিরোধিতা করে বলেন:

"সন্দেহ নেই যে মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বজুড়ে কিছু বিভাজন রয়েছে। কিন্তু সেই বিভাজনের মূল কারণ সভ্যতা বা ধর্ম নয়। বরং আজকের বিভাজনটি গড়ে উঠেছে নিপীড়ন বনাম গণতান্ত্রিক শাসন, রুদ্ধদ্বার নীতি বনাম উন্মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং উদারতা বনাম চরমপন্থার মধ্যে।"

নিজের বক্তব্যকে আরও স্পষ্ট করে তিনি বলেন:

"ইসলামী বিশ্বের প্রচলিত মূল্যবোধের সাথে পশ্চিমা বা গণতান্ত্রিক আদর্শের সজ্ঘাত অনিবার্য–এই ধারণা আমরা বিশ্বাস করি না। কারণ ইসলামী মূল্যবোধের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলো–যেমন পারিবারিক ও সামাজিক সংহতি, বিশ্বাস এবং সৎকর্মের প্রতি নিষ্ঠা–আমাদের কাছে মোটেও অপরিচিত কিছু নয়। মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার মানুষ যখন তাদের রাষ্ট্র ও সমাজে এই মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা নিয়ে বিতর্ক করে, তা আমাদের অবাক করে না। বিশ্বের অন্যান্য প্রান্তের মানুষের মতোই তারা একটি জনমুখী সরকার, মানবাধিকারের নিশ্চয়তা এবং সুষ্ঠু জীবনব্যবস্থা গড়ে তোলার পথ খুঁজছে। এই প্রেক্ষাপটে তারা যদি ইসলামের দিকে ফিরে তাকায়, তবে তা খুবই স্বাভাবিক ও সার্বজনীন একটি বিষয়। এটি সজ্ঘাতের কোনো কারণ হতে পারে না।"

বসনিয়া ও মধ্যপ্রাচ্যের উদাহরণ টেনে তিনি আরও বলেন:

"আজকের বিশ্ব বিবেককে যা পীড়িত করছে তা সভ্যতার সজ্ঘাত নয়। বসনিয়াতে আমাদের শত্রু ছিল চরম গোঁড়ামি ও সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ। সার্বরা তাদের নগ্ন আগ্রাসন আড়াল করতে মুসলিম অগ্রযাত্রার অজুহাত দিলেও আমরা তা বিশ্বাস করি না। আমরা বসনিয়াকে এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসেবে দেখতে চেয়েছি যেখানে খ্রিস্টান ও মুসলমানরা শান্তিতে সহাবস্থান করবে। একইভাবে সাদ্দাম হোসেন কুয়েত দখলের সময় ইসলামের স্লোগান দিলেও সেখানে ধর্ম কোনো মুখ্য বিষয় ছিল না। আমরা লিবিয়া ও সুদান–উভয় দেশেরই বিরোধিতা করি, তবে তা ইসলামের কারণে নয়, বরং তাদের উগ্রপন্থার কারণে। ঠিক তেমনি কিছু গোষ্ঠী যখন ইসলামের আড়ালে চরমপন্থা অবলম্বন করে, আমরা তখন কেবল সেই চরমপন্থারই বিরোধিতা করি, ইসলামের নয়।"

অ্যান্থনি লেক এরপর তাদের তিন দফা রাজনৈতিক লক্ষ্যের কথা ঘোষণা করেছেন, যার ওপর ভিত্তি করেই মার্কিন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালিত হয়। প্রথমত, অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে আরব-ইসরায়েল শান্তি প্রক্রিয়া এগিয়ে নেওয়া; দ্বিতীয়ত, যেসব দেশ ধর্মীয় বা সেক্যুলার উগ্রপন্থা ও সন্ত্রাসবাদকে উৎসাহিত করে তাদের প্রতিহত করা; এবং তৃতীয়ত, যেসব দেশ মুক্তবাজার অর্থনীতি,

গণতন্ত্রের বিকাশ এবং গণবিধ্বংসী অস্ত্র নিয়ন্ত্রণে সচেষ্ট তাদের সর্বাত্মক সহায়তা প্রদান। সম্ভবত এই তিন নীতির আলোকেই তিনি তার পূর্বোক্ত বক্তব্যটি সাজিয়েছেন।

মার্কিন প্রশাসনের আরেকজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি, নিকট প্রাচ্য বিষয়ক আন্ডার সেক্রেটারি অফ স্টেট রবার্ট পেলেট্রু, 'মিডল ইস্ট পিস কাউন্সিল' আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে ইসলাম সম্পর্কে মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করেছেন। মার্কিন সমাজে 'মৌলবাদ' নিয়ে প্রবল ভীতি ও বিরোধিতা রয়েছে–এ কথা স্বীকার করে তিনি বলেন:

"মধ্যপ্রাচ্যের অনেক ক্ষেত্রেই 'ইসলামী মৌলবাদ' শব্দটি অত্যন্ত অসংগতভাবে ব্যবহার করা হয়। কখনও সৌদি আরবের ক্ষেত্রে, কখনও যারা স্রেফ নিজস্ব বিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধের উজ্জীবন চায় অথবা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ও পশ্চিমা অপপ্রভাবের প্রতিবাদ করে তাদের ক্ষেত্রে, আবার কখনও বা যারা ইসলামের নাম নিয়ে সন্ত্রাস ও সহিংসতায় লিপ্ত তাদের ক্ষেত্রেও–এই শব্দটির যথেচ্ছ ব্যবহার হচ্ছে।"

পেলেট্রু আরও বলেন যে, 'পলিটিক্যাল ইসলাম' বা 'ইসলামিস্ট' শব্দগুলোর ক্ষেত্রেও একই বিভ্রান্তি কাজ করে। বর্তমানে 'ইসলামিস্ট' বলতেই রাজনৈতিক লক্ষ্য-উজ্জীবিত মুসলিমদের বোঝানো হচ্ছে, যা মার্কিন প্রশাসন নীতিগতভাবে ভুল মনে করে না। কারণ, বহু বৈধ ও সামাজিকভাবে দায়বদ্ধ মুসলিম সংগঠন রাজনৈতিক লক্ষ্য নিয়ে কাজ করে। তবে তিনি স্পষ্ট করেন যে, যারা আইন ভঙ্গ করে এবং অস্ত্রের জোরে লক্ষ্য অর্জন করতে চায়, তারা চরমপন্থী–আর এমন চরমপন্থী সেক্যুলারদের মধ্যেও রয়েছে।

রবার্ট পেলেট্রু স্বীকার করেছেন যে, ইসলাম একটি মহান ধর্ম এবং এর ঐতিহাসিক সভ্যতা পশ্চিমা সংস্কৃতিকেও সমৃদ্ধ করেছে। মধ্যযুগে ইসলাম বিশ্বজুড়ে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যে বিকাশ ঘটিয়েছিল তাও অনস্বীকার্য। তা সত্ত্বেও পশ্চিমা গণমাধ্যমে ইসলাম ও মৌলবাদকে কেবল রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, জাতিগত দাঙ্গা কিংবা সন্ত্রাসবাদের সমার্থক হিসেবে দেখানো হয়। ওয়ার্ল্ড ট্রেড সেন্টারে বোমা হামলা, মিসর ও আলজেরিয়ায় বিদেশিদের ওপর আক্রমণ এবং ইরান ও লিবিয়ার বিভিন্ন ঘটনা মার্কিন জনগণের মনে ইসলাম সম্পর্কে নেতিবাচক ধারণা সৃষ্টি করেছে।

অ্যান্থনি লেক এবং রবার্ট পেলেট্রুর বক্তব্যের মূল সুর হলো: ইসলামের সাথে পশ্চিমের কোনো মৌলিক বিরোধ নেই; বিরোধ কেবল উগ্রপন্থা ও উগ্রপন্থীদের সাথে। গণমাধ্যমের প্রভাবে পশ্চিমাদের চোখে ইসলাম কেবল 'সহিংসতা ও অসহিষ্ণুতা'র ধর্ম হিসেবে চিত্রিত হচ্ছে, যার ফলে একধরণের বিভ্রান্তি ও বিরোধিতা তৈরি হয়েছে। তবে এর অর্থ এই নয় যে, পশ্চিমা ও ইসলামী সভ্যতার মধ্যে অনিবার্য কোনো যুদ্ধ শুরু হয়েছে বা হবে।

তাদের এই যুক্তি মেনে নিলেও একটি বড় প্রশ্ন থেকেই যায়: পশ্চিমা বিশ্ব না হয় খণ্ডিত তথ্যের কারণে ইসলাম সম্পর্কে বিভ্রান্ত হলো, কিন্তু সারা বিশ্বের সাধারণ মুসলমানদের মনে কেন এই বদ্ধমূল ধারণা তৈরি হলো যে, পশ্চিমারা ইসলামকে বৈরিতার চোখে দেখে এবং তারা কোথাও ইসলামকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দিতে চায় না? কেবল গুটিকয়েক উগ্রপন্থী গোষ্ঠীর সন্ত্রাস দেখে কি মুসলিম জনমনে এমন গভীর ক্ষোভ তৈরি হয়েছে? পৃথিবীতে এমন সহিংস ঘটনা কয়টিই বা ঘটেছে? তাছাড়া সেসব ঘটনার অধিকাংশ ছিল নির্দিষ্ট কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়। সেই ঘটনাগুলোতে মার্কিন বিরোধিতার বিষয়টি এতটাও প্রকট ছিল না যে তা বিশ্বব্যাপী পশ্চিম-বিরোধী জনমত তৈরি করবে।

আসলে মুসলিম বিশ্বে এই তীব্র মার্কিন-বিরোধী মনোভাবের পেছনে রয়েছে এক দীর্ঘ পটভূমি। স্নায়ুযুদ্ধের সময়কার বামপন্থী প্রচারণার রেশ আজও কিছুটা বিদ্যমান থাকলেও মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব নীতিই মুসলমানদের এই ক্ষোভের প্রধান কারণ।

১. ফিলিস্তিন নীতি ও ইসরায়েল তোষণ

মার্কিন মধ্যপ্রাচ্য নীতির সবচেয়ে বিতর্কিত দিক হলো ইসরায়েলের নিরাপত্তা ও সমৃদ্ধিকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেওয়া। আশ্চর্যের বিষয় হলো, ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের মূলে ব্রিটেন ও রাশিয়ার অগ্রণী ভূমিকা থাকলেও, একে রক্ষার একক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এটি করতে গিয়ে তারা গোটা মুসলিম বিশ্বের জনমতকে চরমভাবে উপেক্ষা করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে কাশ্মীর বা আফগান ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের কিছুটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও, তা ফিলিস্তিন প্রশ্নে মুসলমানদের আহত হৃদয়ে প্রলেপ দিতে পারেনি।

২. নীতিগত দ্বিমুখী আচরণ

রাশিয়া যখন কাশ্মীর ও আফগানিস্তানের প্রেক্ষাপট থেকে সরে দাঁড়ালো, তখন এই দুই ইস্যুতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ভোল পাল্টালো, তাতে মুসলিম বিশ্বে ধারণা তৈরি হয়েছে যে–যুক্তরাষ্ট্রের আগের নীতি ছিল কেবল রুশ-বিরোধিতার কৌশল, মুসলমানদের প্রতি কোনো দরদ থেকে নয়। বর্তমানে ইসলামপন্থীদের কোনো সুযোগ না দেওয়ার যে মানসিকতা তারা দেখাচ্ছে, তা এই ধারণাকেই বদ্ধমূল করেছে।

৩. কুয়েত ও ইরাক ইস্যুতে দ্বৈতনীতি

কুয়েতকে ইরাকি দখলদারিত্ব থেকে মুক্ত করতে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কিন্তু তারা কাঙ্ক্ষিত প্রশংসা পায়নি দু'টি কারণে। প্রথমত, ইরাকি দখলদারিত্বকে তারা যেভাবে দেখেছে, ফিলিস্তিনে ইহুদিদের দখলদারিত্বকে সেভাবে দেখেনি। দ্বিতীয়ত, কুয়েত উদ্ধারের ক্ষেত্রে মার্কিন তেল-স্বার্থই মুখ্য ছিল বলে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করে। যুক্তরাষ্ট্র এই ভুল ধারণা ভাঙাতে ব্যর্থ হয়েছে।

৪. বসনিয়া ও সার্ব আগ্রাসন

বসনিয়ার ক্ষেত্রে ইউরোপীয় দেশগুলোর তুলনায় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগ প্রশংসনীয় হলেও মুসলমানদের মনে খটকা রয়ে

গেছে। তারা দেখেছে, আগ্রাসী ইরাকের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, তার চেয়েও জঘন্য ও রক্তক্ষয়ী আগ্রাসন চালানো সার্বদের বিরুদ্ধে তারা সেই একই কঠোরতা দেখায়নি। এখান থেকেই ধারণা জন্মেছে যে, পশ্চিমা নীতির ভিত্তি ন্যায়-অন্যায় বা গণতন্ত্র-স্বৈরতন্ত্র নয়, বরং 'ধর্মীয় সভ্যতা'।

৫. গণতন্ত্র নিয়ে স্ববিরোধিতা

যুক্তরাষ্ট্রের একটি ঘোষিত নীতি হলো: 'যারা ক্ষমতা দখলের জন্য গণতন্ত্রকে ব্যবহার করে এবং ক্ষমতায় গিয়ে সেই গণতন্ত্রকেই ধ্বংস করে দেয়, তাদের প্রতি আমরা সন্দিহান।' এই নীতিটি আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রকটভাবে দৃশ্যমান হয়েছে। সেখানে ইসলামপন্থীরা নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয় লাভ করলেও 'গণতন্ত্রের রক্ষক' যুক্তরাষ্ট্রের কোনো সমর্থন পায়নি। উল্টো আলজেরিয়ার সামরিক জান্তা যখন নির্বাচন বাতিল করে বিজয়ী 'ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট'কে বেআইনি ঘোষণা করল, তখন যুক্তরাষ্ট্র নীরব ছিল। অথচ মিয়ানমারে (বার্মা) অং সান সু চির দলের বিজয়ের পক্ষে পশ্চিমারা এতটাই সোচ্চার ছিল যে তাকে নোবেল পুরস্কার পর্যন্ত দেওয়া হয়।

যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব মনে করে, আলজেরিয়ার ইসলামপন্থীরা আসলে গণতন্ত্রে বিশ্বাসী নয় এবং ক্ষমতায় গেলে তারা গণতন্ত্র বজায় রাখবে না। এই ধারণাটি সম্পূর্ণ কাল্পনিক এবং এর সপক্ষে তাদের কাছে কোনো অকাট্য প্রমাণ নেই। ইরানেও দলীয় ব্যবস্থা ও নির্বাচন বিদ্যমান। ইসলামপন্থীরা ক্ষমতায় এলে গণতন্ত্র থাকবে না–এই আগাম ধারণা পোষণ করার অর্থ হলো, যুক্তরাষ্ট্র এখানে ইসলামকেই 'অপরাধী' হিসেবে কাঠগড়ায় দাঁড় করাচ্ছে।

তিনি কার্যত এটাই বোঝাতে চাইছেন যে, ইসলামে গণতন্ত্রের কোনো স্থান নেই। উল্লেখ্য, পশ্চিমা বিশ্বে বা তাদের মিত্রদের মধ্যে এমন ধারণা পোষণকারীর অভাব নেই। যেমন, ইসরায়েলি রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মার্টিন ক্রোমার বলেছেন:

"Militant Islamic groups, by nature, cannot be democratic, pluralistic, egalitarian or pro-western." অর্থাৎ, সংগ্রামী বা 'মিলিট্যান্ট' ইসলামি গোষ্ঠীগুলো স্বভাবগতভাবেই গণতান্ত্রিক, বহুত্ববাদী, সমতাবাদী কিংবা পশ্চিম-ঘেঁষা হতে পারে না। এখানে ক্রোমার যে 'মিলিট্যান্ট' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, এটি এমন এক পরিভাষা যা দিয়ে যেকোনো ইসলামি দলকেই গণতন্ত্র-বিরোধী হিসেবে দাগিয়ে দেওয়া সহজ।

একই সুর প্রতিধ্বনিত হয়েছে প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ বার্নার্ড লুইসের কণ্ঠেও। তার মতে–ইসলাম ও উদারনৈতিক গণতন্ত্র কখনো স্বাভাবিক সহযোগী হতে পারে না ("The nature and history of Islam do not make liberal democracy and Islam natural bed-fellows")। ইসলাম সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না রেখেও 'ইসলাম বিশেষজ্ঞ' সেজে বসা এসব পণ্ডিতদের কথাই যদি মার্কিন নীতিনির্ধারকদের ধ্রুবসত্য হয়, তবে আলজেরিয়ার ইসলামপন্থী গণতন্ত্রীদের তারা অবিশ্বাস করবে–এটাই স্বাভাবিক।

যদি বিষয়টি এমনই হয়, তবে অ্যান্থনি লেক ও রবার্ট পেলেট্রুর সেই দাবি– 'বর্তমান সঙ্ঘাত ইসলাম ও পশ্চিমা সভ্যতার সঙ্ঘাত নয়'–তা ধোপে টেকে না। কারণ, ইসলামে যদি গণতন্ত্রেরই স্থান না থাকে, তবে গণতন্ত্রকে প্রাণশক্তি হিসেবে গণ্য করা পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামের সহাবস্থান সম্ভব হবে কীভাবে?

আবার যদি লেক ও পেলেট্রুর কথাই সত্য হয়–অর্থাৎ তারা যদি সত্যিই বিশ্বাস করেন যে ইসলাম ও গণতন্ত্র পরস্পর বিরোধী নয়–তবে আলজেরিয়ার ক্ষেত্রে তাদের নীতি ছিল চরম ভুল। তাদের অবশ্যই এটি বিশ্বাস করতে হবে যে, প্রকৃত ইসলামি দল ও গোষ্ঠীগুলো আদর্শগতভাবেই গণতান্ত্রিক। বিশ্ব যখন রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন বা প্রতিনিধি নির্বাচনের কথা ভাবতেও শেখেনি, ইসলাম তখন মানুষকে এই অধিকারের পথ দেখিয়েছে এবং বাস্তবে তা প্রয়োগ করে প্রমাণ করেছে। রাষ্ট্র ও নির্বাচন পদ্ধতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে ইসলাম বিশেষজ্ঞ বা সুধী সমাজকে (আহলে রায়) যে ব্যাপক স্বাধীনতা দিয়েছে, তা ইসলামের সীমাবদ্ধতা নয়; বরং ইসলাম যে সব কাল ও সব পরিবেশের জন্য উপযোগী–এটি তারই প্রগতিশীল প্রমাণ।

সারকথা হলো, অ্যান্থনি লেক ও রবার্ট পেলেট্রু অস্বীকার করলেও ইসলামি ও পশ্চিমা সভ্যতার দ্বন্দ্বের একটি ঐতিহাসিক অস্তিত্ব রয়েছে। আবার সঙ্ঘাতের যে ভিন্ন ব্যাখ্যা তারা দিয়েছেন, সেটিও একটি রূঢ় বাস্তবতা। বাস্তবতা হলো–দু'টি সভ্যতা পাশাপাশি থাকলেই যে তাদের মধ্যে সঙ্ঘাত অনিবার্য, তা নয়। বিশেষ করে ইসলামি সভ্যতা এবং খ্রিস্টধর্ম দ্বারা প্রভাবিত পশ্চিমা সভ্যতার মধ্যে সঙ্ঘাতের চেয়ে মৈত্রীর উপাদানই বেশি। মৌলিক বিশ্বাস ও নৈতিক মূল্যবোধের বহু ক্ষেত্রে এই দুই সভ্যতার মধ্যে গভীর সাদৃশ্য রয়েছে। এমনকি পশ্চিমা সভ্যতাকে যদি ধর্মীয় পরিচয়ের বদলে 'উদারনৈতিক গণতন্ত্রভিত্তিক' সভ্যতাও বলা হয়, তবুও গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও যুক্তিবাদের মতো বিষয়ে ইসলামের সাথে এর ব্যাপক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

এতদসত্ত্বেও স্যামুয়েল হান্টিংটন যে সঙ্ঘাতের কথা বলেছেন, তার অস্তিত্ব অস্বীকার করার উপায় নেই। তবে বর্তমানের এই সঙ্ঘাত পুরোপুরি রাজনৈতিক। আমরা জানি, ভৌগোলিক উপনিবেশবাদের যুগ শেষ হলেও পশ্চিমারা এখন অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্যের নতুন জাল বিস্তার করেছে। এর সাথে যুক্ত হয়েছে তাদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক শক্তি। এই ত্রিমুখী শক্তিতে বলীয়ান হয়ে পশ্চিমা বিশ্ব আজ মুসলিম দেশ ও উন্নয়নশীল বিশ্বের কাছ থেকে 'শর্তহীন আনুগত্য' দাবি করছে। ইসলামের অদম্য স্বাধীনচেতা শক্তিই তাদের এই পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আর ইসলামের এই আত্মিক ও রাজনৈতিক শক্তি ধারণ করছে তারাই, যাদের পশ্চিমাদের ভাষায় 'মৌলবাদী' বলা হয়। ঠিক এই বিন্দুতেই দুই সভ্যতার সঙ্ঘাতটি অনিবার্য হয়ে সামনে চলে আসে, যা

অ্যান্থনি লেকরা কৌশলে এড়িয়ে যাচ্ছেন।

তবুও আমরা লেক ও পেলেট্রুর দেওয়া আশ্বাসে বিশ্বাস রাখতে চাই; আমরা দুই সভ্যতার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান কামনা করি। তবে এর জন্য প্রয়োজন পশ্চিমের 'মোড়লগিরি' বা দাদাগিরির রাজনীতির অবসান। তারা শক্তিতে বড় হতে পারে, কিন্তু সেই শ্রেষ্ঠত্ব যেন আগ্রাসনের রূপ না নেয়। এই আগ্রাসী মনোভাবটুকু ত্যাগ করলেই দুই সভ্যতার সজ্ঘাত অন্তত আশি শতাংশ কমে যাবে এবং সহযোগিতা ও সহমর্মিতার পরিবেশ বিস্তৃত হবে। এতে করে মুসলিম বিশ্বের কোথাও কোথাও যে সহিংসতা বা উগ্রপন্থা রয়েছে, তার মূল কারণগুলোও দূর হয়ে যাবে। দিনশেষে একটি ভারসাম্যপূর্ণ, সহনশীল ও সহযোগী বিশ্বই সবার কাম্য।

দুই.

পশ্চিমা বিশ্বের প্রভাবশালী সাময়িকী 'দ্য ইকোনমিস্ট' ইসলাম ও পাশ্চাত্যের ক্রমবর্ধমান সজ্ঘাতের মূল কারণকে 'রাজনৈতিক' হিসেবে অভিহিত করেছে। তাদের মতে, দুই সভ্যতার যে মৌলিক জীবনদর্শন বা ভিত্তি, তাতে বড় কোনো বিরোধ নেই। ইকোনমিস্ট এই যুক্তিটি প্রত্যাখ্যান করেছে যে, বর্তমান সজ্ঘাত প্রধানত আদর্শিক। তাদের বিশ্লেষণ অনুযায়ী, উভয় অঞ্চলের সমসাময়িক রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক কিছু ঘটনাই এই বিরোধের প্রেক্ষাপট তৈরি করেছে।

ইকোনমিস্টের এই সুর অতীতেও অনেক পশ্চিমা পণ্ডিতের কণ্ঠে শোনা গেছে। বিশ্বখ্যাত ইতিহাসবিদ ও প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেমেটিক লিটারেচার প্রোগ্রামের প্রধান ফিলিপ হিত্তি লিখেছেন:

"আদর্শের চেয়ে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যবধান ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করেছে বেশি।"

তিনি এই দুই সভ্যতার আদর্শিক ঐক্যের কথা বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, জুডাইজম (ইহুদি ধর্ম) ও খ্রিস্টবাদ যদি যথাক্রমে 'ওল্ড টেস্টামেন্ট' ও 'নিউ টেস্টামেন্ট'-এর সৃষ্টি হয়, তবে ইসলামের উৎস হলো কুরআন নামক 'থার্ড টেস্টামেন্ট'।

সাম্প্রতিক সময়ে মারভিন স্টোন ও টমাস টোল তাদের বিখ্যাত গ্রন্থ 'Encounter with the Future: A Forecast of Life into the 21st Century'-তে পশ্চিমা সভ্যতার বন্ধু ও শত্রুদের নিয়ে আলোচনা করেছেন। তারা দেখিয়েছেন যে, খ্রিস্টধর্ম এখন পশ্চিমা সভ্যতার অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাই সেখান থেকে কোনো চ্যালেঞ্জ আসার সম্ভাবনা নেই। অন্যদিকে জুডাইজম, বৌদ্ধধর্ম কিংবা হিন্দুধর্মের সেই সামর্থ্য নেই যে তারা পাশ্চাত্যের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে দাঁড়াবে। তাদের মতে, একমাত্র ইসলামের সাথেই পশ্চিমা সভ্যতার সজ্ঘাত অনিবার্য হয়ে উঠছে। এই বিরোধের উৎস মূলত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। তাদের ভাষায়:

"কেবল ইসলামই পাশ্চাত্যের জন্য হুমকি; যা গত ২০ বছর ধরে অর্থনৈতিকভাবে, ১৮০ বছর ধরে রাজনৈতিকভাবে এবং দীর্ঘ ১৫০০ বছর ধরে সামরিকভাবে বিদ্যমান। ইরানে আমাদের (যুক্তরাষ্ট্রকে) 'শয়তান' বলে সম্বোধন এবং মুসলিম বিশ্বে ইসরায়েলকে সমর্থনের কারণে ইসলাম আবারও আমাদের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।"

তবে কেবল রাজনৈতিক ও সামরিক ভীতি কিংবা গত কয়েক দশকের অর্থনৈতিক শক্তিই এই বিরোধের একমাত্র কারণ–এই ব্যাখ্যা পূর্ণাঙ্গ নয়। যদিও সত্য যে, ১৫০০ বছরের সামরিক সজ্ঘাতের ইতিহাস এবং এই বহুমুখী ভীতি থেকেই পাশ্চাত্য শাহ-এর মতো স্বৈরাচারী ও ইসলাম-বিদ্বেষী শাসকদের সমর্থন দিয়ে আসছে এবং ইসরায়েলের মতো বৈরী শক্তিকে মদদ দিচ্ছে। এসব দৃশ্যমান রাজনৈতিক কারণের অন্তরালে পাশ্চাত্যের আরেকটি রূপও স্পষ্ট হয়ে উঠছে–তা হলো ইসলামের ধর্মীয় নীতি ও মূল্যবোধকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ করা।

মারভিন স্টোন ও টমাস টোল তাদের উল্লিখিত গ্রন্থে আরও বলেছেন:

"পাশ্চাত্যের চোখে ইসলাম এতটাই দুর্জ্ঞেয় যে, এর আচার-অনুষ্ঠান ও নীতিগুলোকে আমরা বর্তমান যুগে অচল মনে করি। ইসলামি আইন ভঙ্গের দায়ে বেত্রাঘাত, পাথর নিক্ষেপ, অঙ্গচ্ছেদ কিংবা প্রাণদণ্ডের মতো শাস্তিকে আমরা 'অভিশাপ' বলে মনে করি।"

তারা আরও যোগ করেন যে, মুসলিম বিশ্বে মসজিদ ও রাষ্ট্র পৃথক নয়; সেখানে রাষ্ট্রই হলো মসজিদ। ফলে ইসলামের সমালোচনাকে কেবল একটি মতপ্রকাশ হিসেবে নয়, বরং রাষ্ট্র ও সমাজের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে গণ্য করা হয়।

পশ্চিমা লেখকদের এই বক্তব্যে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, তা কোনোভাবেই রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়–বরং পুরোপুরি আদর্শিক। তারা ইসলামের বিধানগুলোকে 'অভিশাপ' মনে করছেন কারণ এর অন্তর্নিহিত দর্শন তারা বোঝেন না এবং বুঝতে চেষ্টাও করেন না। তারা ইসলামকে বিচার করছেন একান্তই নিজস্ব নীতি ও মূল্যবোধের মাপকাঠিতে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্যই মূলত ইসলাম ও পাশ্চাত্যের মধ্যে বিশাল ব্যবধান তৈরি করেছে এবং পাশ্চাত্য এই মতপার্থক্যকে এখন সক্রিয় 'বিরোধিতায়' রূপান্তর করেছে।

যেকোনো বিষয়ে মতপার্থক্য থাকা স্বাভাবিক, কিন্তু সেই পার্থক্যকে যখন অন্য পক্ষকে দমনের হাতিয়ার করা হয়, তখন তা শান্তি ও সহাবস্থানকে বিঘ্নিত করে সজ্ঘাত ডেকে আনে। পাশ্চাত্য আজ কেবল ইসলামি আইনের সাথে দ্বিমত পোষণ করেই ক্ষান্ত নয়, বরং তারা বিশ্বজুড়ে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রপাগান্ডায় লিপ্ত হয়েছে। তাদের লক্ষ্য হলো এই দণ্ডবিধিগুলো সমূলে উৎপাটন করা। তারা এই আইনের কল্যাণকর দিক নিয়ে বিন্দুমাত্র ভাবতে নারাজ। একইভাবে, তারা ইসলামের পর্দা প্রথাকেও নেতিবাচকভাবে উপস্থাপন করে, অথচ পর্দার অভাবে তাদের নিজস্ব সমাজব্যবস্থা যে নৈতিক অবক্ষয়ের শিকার

হচ্ছে, সেদিকে তাদের ভ্রুক্ষেপ নেই।

পাশ্চাত্য অন্ধভাবে ইসলামি নীতিবোধের বিরোধিতা করছে, যা মুসলিম দেশগুলোতে সামাজিক উত্তেজনা ও অশান্তি সৃষ্টি করছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে 'ফতোয়া' বিরোধিতার নামে আলেম-ওলামাদের বিরুদ্ধে যে পরিকল্পিত প্রচারণা চালানো হয়, তার কথা বলা যায়। এটি সবারই জানা যে, এনজিও-র ছদ্মাবরণে পশ্চিমারাই এসব প্রচারণার নেপথ্য কারিগর। এই চিত্র কেবল বাংলাদেশের নয়, বরং প্রতিটি মুসলিম দেশেই পশ্চিমা বিশ্ব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ইসলামের মূল্যবোধ-বিরোধী অভিযান চালাচ্ছে। এই সামগ্রিক পরিস্থিতি এটাই প্রমাণ করে যে, এই সজ্ঘাত কেবল রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক নয়, বরং এর মূলে রয়েছে গভীর এক আদর্শিক সংকট।

পশ্চিমের এই সর্বাত্মক অভিযানকে আজ ইসলামের বিরুদ্ধে এক গভীর আগ্রাসন হিসেবে দেখা হচ্ছে। এই আগ্রাসনের মূল লক্ষ্য হলো ইসলামের প্রাণশক্তিকে ধূলিসাৎ করা। আমরা জানি, ইসলামের প্রাণশক্তি নিহিত এর আদর্শিক দৃঢ়তা এবং দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এর মৌলিকত্বের ওপর অটল থাকার মধ্যে। পশ্চিমা বিশ্ব এই সত্যটি অত্যন্ত স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করে।

মারভিন স্টোন ও টমাস টোল তাদের গ্রন্থে ইসলামকে বর্তমান বিশ্বের দ্রুততম বিকাশমান ধর্ম হিসেবে চিহ্নিত করে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন: ধর্ম সম্পর্কে চরম সংশয়বাদের এই যুগে ইসলাম কীভাবে এতটা প্রাণপ্রাচুর্যে ভরপুর? তারা নিজেরাই এর উত্তর দিয়ে বলেছেন:

"ইসলাম একটি 'মৌলবাদী' ধর্ম (Fundamentalist religion); অর্থাৎ ইসলাম তার মূলনীতির ওপর অটল এবং সেখানে কোনো প্রকার বিকৃতির অবকাশ দেয় না। সেই সূত্রে ইসলামের অনুসারীরাও নীতিনিষ্ঠ। তারা জীবন পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো আপস বা বিচ্যুতিকে প্রশ্রয় দেয় না।"

ইসলাম ও মুসলমানদের এই অনমনীয় বৈশিষ্ট্যই ইসলামের টিকে থাকার শক্তি। এই বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেললে ইসলামও অন্যান্য অনেক ধর্মের মতো প্রাণহীন আচার-সর্বস্বতায় পর্যবসিত হতো। আর ইসলামকে এই প্রাণশক্তিহীন করার লক্ষ্যেই পাশ্চাত্যের যাবতীয় আয়োজন। তাদের এই লড়াইয়ের কেন্দ্রবিন্দু হলো ইসলামের 'নীতিনিষ্ঠতা', যাকে তারা 'মৌলবাদ' হিসেবে নেতিবাচকভাবে প্রচার করছে। আমেরিকার প্রভাবশালী প্রেসিডেন্ট থেকে শুরু করে মুসলিম বিশ্বের পশ্চিমা এজেন্টরা পর্যন্ত এই 'মৌলবাদ'-এর বিরুদ্ধে সোচ্চার। আজকের বিশ্বে পশ্চিমা সভ্যতার সাথে ইসলামের প্রধান বিরোধের ক্ষেত্রও এটিই।

পাশ্চাত্য যদি ইসলামের বিরুদ্ধে এই আদর্শিক বিদ্বেষ ত্যাগ করে, তবে ফিলিস্তিন, আলজেরিয়া কিংবা সুদানের মতো জটিল সংকটের সহজ সমাধান সম্ভব। কিন্তু সমস্যা হলো, পশ্চিম এখন 'মৌলবাদ বিরোধিতা'কে তাদের সভ্যতার অন্যতম নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা মুখে বলে যে তারা 'চরমপন্থা'র বিরোধী, 'ধর্মানিষ্ঠা'র নয়। কিন্তু এই চরমপন্থার কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা তারা আজ পর্যন্ত দেয়নি। দেখা যায়, তারা যেমন সহিংস কার্যক্রমকে চরমপন্থা বলে, তেমনি গণতান্ত্রিক ধারায় বিশ্বাসী ইখওয়ানুল মুসলিমুন বা জামায়াতে ইসলামীর মতো সংগঠনের ধর্মানিষ্ঠতাকেও 'চরমপন্থা' বলে আখ্যা দেয়। এখানে এসে তারা নীতিনিষ্ঠতা ও উগ্রবাদকে একাকার করে ফেলছে। তারা ধর্মীয় বিধানের একনিষ্ঠ অনুসরণকেই 'মৌলবাদ' ও 'চরমপন্থা'র তকমা দিয়ে অন্ধ বিরোধিতায় লিপ্ত হয়েছে।

এই দ্বন্দ্বে পশ্চিম 'মানবাধিকার'কে একটি ঢাল হিসেবে ব্যবহার করছে। তারা প্রচার করতে চায় যে, ধর্মের অটল বিধি-বিধান মানবাধিকারের পরিপন্থী। অথচ তাদের এই দৃষ্টিভঙ্গি যে অবাস্তব, কৃত্রিম এবং খোদ মানবাধিকারের মৌলিক চেতনার বিরোধী—সেটি তারা অস্বীকার করছে। মূলত বস্তুবাদী দর্শনের বিকৃতিই তাদের চিন্তাকে এই অন্ধত্বের দিকে ঠেলে দিয়েছে।

আমি আবারও বলছি, ইসলামের সাথে পশ্চিমের এই বিরোধ মূলত তাদের বস্তুবাদী দর্শনের সাথে ইসলামের আদর্শিক সজ্ঘাত। পশ্চিমা এই বস্তুবাদী দর্শনের বয়স বড়জোর তিনশ বছর, যা আজ গোটা পাশ্চাত্যকে গ্রাস করেছে। পশ্চিম যদি তাদের এই ক্ষতিকর বস্তুবাদী প্রভাব—বিশেষ করে 'নীতি-বিবর্জিত যুক্তিবাদ' ত্যাগ করতে পারে, তবে ইসলামের সাথে তাদের আদর্শিক দূরত্ব ঘুচে যাবে। তখন ধর্মানিষ্ঠা বা মৌলবাদ তাদের কাছে কোনো ভীতিকর বিষয় হবে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থের সজ্ঘাত কমিয়ে আনতে পারলে ইসলাম ও পাশ্চাত্য একই মঞ্চে দাঁড়াতে পারে। নিরীশ্বরবাদী কনফুসীয় সভ্যতার চেয়ে 'আহলে কিতাব' বা আসমানি কিতাবে বিশ্বাসী খ্রিস্টান প্রধান পশ্চিম ইসলামের কাছে অবশ্যই অধিকতর নিকটবর্তী ও অগ্রাধিকার পাওয়ার যোগ্য।

যতদিন পর্যন্ত সেই কাঙ্ক্ষিত সমঝোতা না আসছে, ততদিন সবাইকে 'শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান' নীতি মেনে নিতে হবে। মতপার্থক্য নিয়েও পাশাপাশি থাকা সম্ভব। শিল্প-সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও তেমন শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা চলতে পারে, যেমনটি চলছে অর্থনীতি ও বাণিজ্যের ক্ষেত্রে। তবে এর জন্য পশ্চিমকে তাদের 'বস্তুবাদী আগ্রাসন' ও কৃত্রিম 'মৌলবাদ আতঙ্ক' ত্যাগ করতে হবে।

পরিশেষে এটি বলা আবশ্যক যে, মুসলমানদের ধর্মানিষ্ঠতা বা মৌলবাদ মূলত আত্মগঠনমূলক, শান্তিপূর্ণ ও প্রচারমুখী—আগ্রাসী কোনো বিষয় নয়। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন তাঁর রাসূল (সা.)-কে স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, তাঁকে মানুষের ওপর 'দারোগা' বা জবরদস্তিকারী হিসেবে পাঠানো হয়নি; তাঁর দায়িত্ব কেবল সত্যের বাণী পৌঁছে দেওয়া। তবে ইসলামের ভিত্তিতে জীবন গঠন এবং এই জীবনব্যবস্থাকে রক্ষার ক্ষেত্রে মুসলমানরা বিন্দুমাত্র ছাড় দিতে রাজি নয়। নীতিনিষ্ঠার বিচারে এটিই ইসলামের 'মৌলবাদ' এবং এই বৈশিষ্ট্যই ইসলামের প্রাণ। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের কাছ থেকে এই একনিষ্ঠ আনুগত্যই প্রত্যাশা করেন। ■

হরমুজ সংকট : ইরান-যুক্তরাষ্ট্র দ্বন্দ্ব ও বিশ্ব অর্থনীতির ঝুঁকি

আ ফ ম খালিদ হোসেন, পিএইচডি
সাবেক উপদেষ্টা, ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়,
অন্তর্বর্তী সরকার

বিশ্বমানচিত্রে হরমুজ প্রণালি এক টুকরো সরু জলরেখা-কিন্তু এর ভেতরেই জমাট বেঁধে আছে আধুনিক সভ্যতার শক্তি, অর্থনীতি ও সজ্ঞাতের ইতিহাস। পারস্য উপসাগর আর ওমান উপসাগরের মাঝখানে অবস্থিত এই প্রণালি শুধু ভৌগোলিক বাস্তবতা নয়; এটি একধরনের অদৃশ্য স্নায়ু, যার স্পন্দনে ওঠানামা করে বৈশ্বিক জ্বালানি বাজার, কূটনীতি এবং যুদ্ধের সম্ভাবনা।

প্রতিদিন বিশ্বের সমুদ্রপথে পরিবাহিত তেলের প্রায় এক-চতুর্থাংশ এই সংকীর্ণ জলপথ দিয়ে অতিক্রম করে। কাতারের তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) থেকে শুরু করে সৌদি আরব, ইরাক, কুয়েত ও আমিরাতের অপরিশোধিত তেল-সবই যেন এই এক দরজার ওপর নির্ভরশীল। ফলে হরমুজ শুধু একটি পথ নয়, বরং এক 'চেকপয়েন্ট'-যেখানে সামান্য অস্থিরতাও বিশ্ববাজারে ঝড় তোলে।

ইরান দীর্ঘদিন ধরেই এই প্রণালিকে তার কৌশলগত শক্তির কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। উপকূলীয় ক্ষেপণাস্ত্র, নৌমাইন, দ্রুতগামী ছোট নৌযান-এসবই 'অসম যুদ্ধের' (asymmetric warfare) এক কার্যকর হাতিয়ার। সংকীর্ণ পথের ভৌগোলিক সুবিধা কাজে লাগিয়ে ইরান অল্প সময়ের জন্য হলেও এই অঞ্চলে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

কিন্তু প্রশ্ন হলো-এতে কি যুদ্ধ জেতা সম্ভব?

আগামীর ইতিহাস কথা বলবে। কারণ হরমুজে যতটা ইরানের ভূগোল, তার চেয়েও বেশি উপস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের নৌশক্তি। বাহরাইনে অবস্থানরত মার্কিন পঞ্চম নৌবহর, আকাশসীমায় আধিপত্য এবং মিত্র আরব রাষ্ট্রগুলোর সমর্থন-সব মিলিয়ে দীর্ঘ মেয়াদে প্রণালি নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা ইরানের জন্য কঠিন হতে পারে।

তবে এটুকু নিশ্চিত-ইরান চাইলে বিশ্ববাজারকে অল্প

সময়ের জন্য হলেও নাড়িয়ে দিতে পারে। আর এই 'নাড়িয়ে দেওয়ার' ক্ষমতাই তার আসল কৌশলগত শক্তি।

হার্গ দ্বীপ : অর্থনীতির হৃদয়ে আঘাত

ইরানের তেল রপ্তানির প্রাণকেন্দ্র হার্গ দ্বীপ–যেন দেশের অর্থনীতির স্পন্দন। যদি কখনো এই দ্বীপকে লক্ষ করে কোনো সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়, তবে তা হবে শুধু একটি স্থাপনায় আঘাত নয়, বরং পুরো অর্থনৈতিক কাঠামোর ওপর এক গভীর ধাক্কা।

এমন পরিস্থিতিতে সজ্ঘাত আর সীমিত থাকবে না। সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, কাতার–প্রতিটি রাষ্ট্রই তাদের জ্বালানি অবকাঠামো রক্ষায় সক্রিয় হয়ে উঠবে। পাল্টা আঘাতে ইরান টার্গেট করতে পারে তেল স্থাপনা, সামরিক ঘাঁটি, এমনকি আঞ্চলিক প্রক্সি শক্তিগুলোকেও সক্রিয় করতে পারে। ফলে যুদ্ধের রূপ নিতে পারে বহুমাত্রিক–স্থল, সমুদ্র, আকাশ, সাইবার এবং অর্থনৈতিক সব ক্ষেত্রেই।

সুয়েজের প্রতিচ্ছবি, নাকি নতুন বিপর্যয়

ইতিহাসের বুকে কখনো কখনো কিছু জলপথ শুধু ভৌগোলিক রেখা থাকে না–সেগুলো হয়ে ওঠে শক্তির প্রতীক, সাম্রাজ্যের স্নায়ু আর বিশ্বরাজনীতির নীরব নিয়ন্ত্রক। ১৯৫৬ সালের সুয়েজ খাল যেমন ছিল ব্রিটিশ-ফরাসি আধিপত্যের শেষ আলো, তেমনি আজকের হরমুজ প্রণালি যেন আধুনিক বিশ্ব অর্থনীতির স্পন্দিত ধমনি। প্রশ্ন জাগে–সুয়েজ যেমন এক সাম্রাজ্যের পতনের সূচনা করেছিল, হরমুজ কি তেমনই আরেক অধ্যায়ের পরিসমাপ্তি লিখতে পারে?

বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে উত্তরটি কিছুটা কাব্যহীন, কিন্তু গভীরতর সত্যে পূর্ণ। সুয়েজ সংকট ছিল এক রূপান্তরের নাটকীয় মুহূর্ত। মিসরের নাসের যখন খাল জাতীয়করণের ঘোষণা দিলেন, তখন তা ছিল শুধু একটি অর্থনৈতিক পদক্ষেপ নয়–বরং ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল ছিন্ন করার এক সাহসী ঘোষণা। ব্রিটেন ও ফ্রান্স সামরিক শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল; কিন্তু ইতিহাসের ঘড়ি তখন অন্যদিকে ঘুরছিল। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের চাপের মুখে তাদের পিছু হটা ছিল শুধু সামরিক পরাজয় নয়–বরং একটি যুগের অবসান। তবে সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ সত্য লুকিয়ে ছিল : শূন্যতা তৈরি হয়নি। এক সাম্রাজ্যের জায়গা নিয়েছিল আরেক শক্তি।

ইতিহাসে সুয়েজ সংকট দেখিয়েছে, একটি গুরুত্বপূর্ণ জলপথকে ঘিরে কীভাবে বৈশ্বিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে। হরমুজ প্রণালির ক্ষেত্রেও সেই আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

তবে পার্থক্যও কম নয়। আজকের বিশ্বে রয়েছে পারমাণবিক শক্তির ছায়া, জটিল জোট রাজনীতি এবং প্রক্সিযুদ্ধের বিস্তার। অর্থনীতি এখন আগের যেকোনো সময়ের চেয়ে বেশি আন্তঃনির্ভরশীল। ফলে একটি সজ্ঘাত দ্রুত সীমান্ত ছাড়িয়ে বৈশ্বিক সংকটে রূপ নিতে পারে। সুয়েজ সংকট তুলনামূলক দ্রুত শেষ হয়েছিল আন্তর্জাতিক চাপের কারণে। কিন্তু হরমুজকেন্দ্রিক সজ্ঘাত শুরু হলে তার পরিণতি হতে পারে দীর্ঘস্থায়ী, অনিশ্চিত এবং বহুমাত্রিক।

হরমুজ প্রণালিকে শুধু একটি ভূগোল দিয়ে বোঝা যাবে না। এটি একদিকে অর্থনীতির লাইফলাইন, অন্যদিকে কৌশলগত চাপ প্রয়োগের অস্ত্র।

ইরান এখানে 'নিয়ন্ত্রণ' নয়, বরং 'প্রভাব' সৃষ্টি করতে চায়। আর যুক্তরাষ্ট্র ও তার মিত্ররা চায় এই প্রবাহ অব্যাহত রাখতে। এই দুই শক্তির টানাপড়েনেই তৈরি করে এক অনিশ্চিত ভারসাম্য–যেখানে যুদ্ধের সম্ভাবনা সবসময় জীবন্ত থাকে।

হরমুজের প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ ভিন্ন। এটি শুধু একটি জলপথ নয়, বরং বৈশ্বিক জ্বালানি প্রবাহের কেন্দ্রবিন্দু–যেখানে প্রতিদিন পৃথিবীর প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল প্রবাহিত হয়। ইরান, তার ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে, এই পথকে স্পর্শ করতে পারে, কাঁপাতে পারে, এমনকি সাময়িকভাবে থামিয়েও দিতে পারে। কিন্তু 'নিয়ন্ত্রণ' আর 'অচল করে দেওয়া'–এই দুইয়ের মধ্যে যে ব্যবধান, সেটিই এখানে মূল সত্য।

ইরান যদি হরমুজে আগুন জ্বালায়, তবে তা হবে দাবানলের মতো–দ্রুত ছড়িয়ে পড়বে, বিশ্ববাজারকে কাঁপিয়ে তুলবে, তেলের দাম আকাশচুম্বী করবে। কিন্তু সেই আগুন দীর্ঘস্থায়ী হবে না। কারণ এই প্রণালি শুধু ইরানের শত্রুদের নয়, বরং বিশ্বের বৃহৎ অর্থনীতিগুলোরও জীবনরেখা। চীন, ইউরোপ, জাপান–সবাই এ পথের ওপর নির্ভরশীল। ফলে হরমুজ বন্ধ হয়ে গেলে তা 'ইরান বনাম যুক্তরাষ্ট্র' থাকবে না; বরং হয়ে উঠবে 'ইরান বনাম বিশ্ব অর্থনীতি'।

আর এখানেই সুয়েজ ও হরমুজের সবচেয়ে বড় পার্থক্য। সুয়েজে শক্তির ভারসাম্য বদলে যাচ্ছিল–ব্রিটেন ছিল অবনতির পথে, যুক্তরাষ্ট্র ছিল উত্থানের দ্বারপ্রান্তে। কিন্তু আজকের বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্র এখনো সামরিক, অর্থনৈতিক ও প্রযুক্তিগত শক্তির কেন্দ্রে অবস্থান করছে। তাকে সরিয়ে দেওয়ার মতো একক শক্তি এখনো দৃশ্যমান নয়।

ইরান যা করতে পারে, তা হলো–বিশ্বকে অস্থির করা। কয়েক সপ্তাহ বা মাসের জন্য বাজারে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া, তেলের দাম বাড়িয়ে বৈশ্বিক অর্থনীতিকে চাপের মুখে ফেলা এবং মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের উদ্বিগ্ন করে তোলা। কিন্তু যা করতে পারবে না, তা হলো–এই অস্থিরতাকে স্থায়ী ভূরাজনৈতিক পরিবর্তনে রূপ দেওয়া।

কারণ সাম্রাজ্যের পতন কোনো একক ঘটনার নাটকীয় ফল নয়। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য ভেঙেছিল ধীরে ধীরে–অর্থনৈতিক ক্লান্তি, দুই বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়, উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা সংগ্রাম–এসব মিলিয়ে। একইভাবে, যদি কখনো মার্কিন

আধিপত্য ক্ষয়প্রাপ্ত হয়, তবে তা ঘটবে দীর্ঘমেয়াদি প্রতিযোগিতা, অভ্যন্তরীণ সংকট এবং প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সম্মিলিত প্রভাবে।

হরমুজ প্রণালি আজকের বিশ্বের এক স্পন্দিত স্নায়ু–যেখানে আঘাত করলে পুরো শরীর কেঁপে উঠবে। ইরান এই স্নায়ুতে চাপ সৃষ্টি করতে পারে, বিশ্বকে অস্থিরতার অন্ধকারে ঠেলে দিতে পারে। এই সংকীর্ণ জলপথ তাই শুধু জাহাজ চলাচলের রাস্তা নয়–এটি আধুনিক বিশ্বের এক অগ্নিপথ, যেখানে প্রতিটি ঢেউয়ের ভেতর লুকিয়ে থাকে অর্থনীতি, কূটনীতি এবং সজ্ঘাতের অদৃশ্য গল্প।

ইতিহাসের ভাষায় বললে–সুয়েজ ছিল এক সূর্যাস্তের রঙিন আকাশ আর হরমুজ, যদি জ্বলে ওঠে, হবে এক ঝড়ো সন্ধ্যা; আলো সম্পূর্ণ নিভিয়ে দিতে না পারলেও দিগন্তকে নিশ্চিত অশান্ত করে তুলতে পারে।

"হরমুজের ঢেউ, এক নীরব অভিঘাত : হরমুজ নিয়ে উত্তেজনা বাংলাদেশের তীব্র জ্বালানি সংকট, মূল্যস্ফীতি ও ভূরাজনীতির এক নীরব অভিঘাত। পৃথিবীর মানচিত্রে হরমুজ প্রণালি একটি সরু নীলরেখা–কিন্তু তার বুকে বয়ে যায় বৈশ্বিক অর্থনীতির স্পন্দন। মধ্যপ্রাচ্যের তেলবাহী জাহাজ যখন এই সংকীর্ণ জলপথ পেরিয়ে যায়, তখন শুধু জ্বালানি নয়, বহন করে বিশ্ববাজারের স্থিতি, উন্নয়নশীল দেশের স্বপ্ন আর সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনের স্বস্তি। সেই পথ যদি হঠাৎ অশান্ত হয়ে ওঠে–যদি যুদ্ধের কালো ছায়া নেমে আসে–তবে তার ঢেউ এসে আছড়ে পড়ে দূরবর্তী বাংলাদেশের তীরেও।"

বাংলাদেশ সরাসরি কোনো যুদ্ধের অংশীদার নয়; কিন্তু এই বৈশ্বিক ব্যবস্থার এক গভীরভাবে সংযুক্ত অংশ। তাই হরমুজে অস্থিরতা মানেই এখানে নীরব সংকটের সূচনা–যা প্রথমে ধরা পড়ে জ্বালানির দামে, পরে ছড়িয়ে পড়ে জীবনের প্রতিটি স্তরে।

প্রথম আঘাত আসে জ্বালানি খাতে। বাংলাদেশ তার প্রয়োজনীয় তেলের প্রায় পুরোটাই আমদানি করে, যার বড় অংশ মধ্যপ্রাচ্যনির্ভর। হরমুজ প্রণালিতে কোনো বিঘ্ন ঘটলেই বিশ্ববাজারে তেলের দাম হঠাৎ লাফিয়ে ওঠে। সেই ধাক্কা ঢাকায়, খুলনায়, চট্টগ্রামে এসে লাগে ডিজেলের দামে, বিদ্যুতের খরচে, এমনকি রান্নাঘরের চুলায়ও। কাতার থেকে আমদানি করা এলএনজি যদি ব্যাহত হয়, তবে বিদ্যুৎকেন্দ্রগুলোর চাকা ধীর হয়ে আসে–লোডশেডিং বাড়ে, শিল্পকারখানার উৎপাদন ব্যাহত হয় আর নাগরিক জীবনে ফিরে আসে অন্ধকারের দীর্ঘশ্বাস।

জ্বালানির এই সংকট অর্থনীতির শরীরে এক ধরনের 'অদৃশ্য জ্বর' সৃষ্টি করে–যার নাম মূল্যস্ফীতি। পরিবহন খরচ বাড়ে, ফলে বাজারে সবকিছুর দাম বাড়তে থাকে। চাল, ডাল, তেল, নির্মাণসামগ্রী–কিছুই এর বাইরে থাকে না। মধ্যবিত্তের হিসাবের খাতা অমিল হয়ে যায় আর নিম্নবিত্তের জীবন হয়ে ওঠে টিকে থাকার সংগ্রাম।

তৈরি পোশাক খাত, যা বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রাণ, সেও এই বৈশ্বিক অস্থিরতার বাইরে নয়। উৎপাদন খরচ বেড়ে গেলে আন্তর্জাতিক বাজারে প্রতিযোগিতা কঠিন হয়ে পড়ে। আবার যদি বৈশ্বিক মন্দা দেখা দেয়, তবে পশ্চিমা ক্রেতাদের চাহিদা কমে যেতে পারে। ফলে রপ্তানি আয় কমে আর তার সরাসরি প্রভাব পড়ে বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভে। ডলার সংকট তীব্র হলে টাকার মান কমে যাওয়ার ঝুঁকি তৈরি হয়–যা আবার নতুন করে মূল্যস্ফীতির আগুন জ্বালায়।

এই সংকট শুধু বাংলাদেশের একার নয়; পুরো দক্ষিণ এশিয়াই এক ধরনের 'জ্বালানিনির্ভর ঝুঁকির বলয়'-এর মধ্যে পড়ে। ভারত তার অর্থনৈতিক শক্তি ও বিকল্প উৎসের কারণে কিছুটা সামাল দিতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান ও শ্রীলঙ্কার মতো দেশগুলো দ্রুত গভীর সংকটে পড়ে যেতে পারে। আঞ্চলিক অস্থিরতা তখন আরো বাড়ে, যার প্রভাব বাংলাদেশও এড়িয়ে যেতে পারে না।

রাজনৈতিক দিক থেকেও এর অভিঘাত কম নয়। জ্বালানি ও নিত্যপণ্যের দাম বাড়লে জনমনে অসন্তোষ বাড়ে, সরকারের ওপর চাপ তৈরি হয় ভর্তুকি বাড়ানোর জন্য। অন্যদিকে পররাষ্ট্রনীতিতে বাংলাদেশকে সূক্ষ্ম ভারসাম্য বজায় রাখতে হয়–মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সঙ্গে সুসম্পর্ক রক্ষা, আবার বৈশ্বিক শক্তিগুলোর সঙ্গেও কৌশলী অবস্থান ধরে রাখা। প্রবাসী আয়ের ক্ষেত্রেও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়; যুদ্ধ বা অস্থিরতা বাড়লে মধ্যপ্রাচ্যে কর্মরত শ্রমিকদের জীবনে ঝুঁকি বাড়ে, যা রেমিট্যান্সপ্রবাহে প্রভাব ফেলতে পারে।

এই বাস্তবতায় প্রশ্ন আসে–বাংলাদেশ কী করতে পারে? উত্তরের পথ একদিনে তৈরি হবে না, কিন্তু দিকনির্দেশ স্পষ্ট। জ্বালানি আমদানির উৎস বহুমুখী করা, নবায়নযোগ্য জ্বালানিতে বিনিয়োগ বাড়ানো, বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবস্থাপনায় সতর্কতা এবং আঞ্চলিক সহযোগিতা জোরদার–এসবই হতে পারে প্রতিরোধের ভিত্তি। বিশেষ করে ভারত, নেপাল ও ভুটানের সঙ্গে বিদ্যুৎ সহযোগিতা ভবিষ্যতের এক গুরুত্বপূর্ণ নিরাপত্তা বলয় গড়ে তুলতে পারে।

হরমুজ প্রণালির জলরাশি আমাদের থেকে হাজার মাইল দূরে, কিন্তু তার ঢেউ অর্থনীতি, রাজনীতি ও সমাজের ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়। তাই এ সংকটকে শুধু দূরের যুদ্ধ হিসেবে দেখার সুযোগ নেই; বরং এটি আমাদের নীতিনির্ধারণ, প্রস্তুতি এবং দূরদর্শিতার এক কঠিন পরীক্ষা।

শেষ পর্যন্ত, হরমুজের অশান্ত জলরাশি আমাদের মনে করিয়ে দেয়–আজকের পৃথিবীতে কোনো দেশই একা নয়। এক প্রান্তের অস্থিরতা অন্য প্রান্তের জীবনে প্রতিফলিত হয়। আর সেই প্রতিফলনের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে আমাদের চ্যালেঞ্জ। ■

ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা: বাস্তবতা, সীমাবদ্ধতা ও করণীয়

আবু বকর রফীক আহমদ, পিএইচডি
সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর ও বর্তমান সদস্য, বোর্ড অব ট্রাস্টিজ, আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় চট্টগ্রাম; ভাইস চেয়ারম্যান, শরিয়াহ সুপারভাইজার কাউন্সিল, ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি

বিশ্বজুড়ে ইসলামি শিক্ষার বিস্তার এবং জ্ঞানচর্চার ধারাবাহিকতায় ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। মধ্যযুগীয় সময়ের ঐতিহাসিক জ্ঞানকেন্দ্র থেকে শুরু করে আধুনিক সময়ের প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়–এই দীর্ঘ যাত্রায় ইসলামি শিক্ষা একটি বহুমাত্রিক রূপ লাভ করেছে। ধর্মীয় জ্ঞান, শরিয়াহ, আরবি ভাষা শিক্ষার পাশাপাশি আধুনিক বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সামাজিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে আজকের ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো এক নতুন শিক্ষামডেল উপস্থাপন করছে।

ইসলামি শিক্ষার ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নামগুলোর একটি হলো আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় (Al-Azhar University)। ৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দে মিসরের কায়রোতে প্রতিষ্ঠিত এই প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর একটি এবং ইসলামি শরিয়াহ, ফিকহ ও আরবি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আল-আজহার মুসলিম বিশ্বের বুদ্ধিবৃত্তিক নেতৃত্ব দিয়েছে।

একইভাবে মরক্কোর ইউনিভার্সিটি অফ আল কোয়ারাউইয়িন (University of Al Quaraouiyine) এবং তিউনিসিয়ার ইউনিভার্সিটি অফ ইজ-জিতুনা (University of Ez-Zitouna) বিশ্বের প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এসব প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় জ্ঞানের পাশাপাশি দর্শন, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞানসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাঠদান হতো, যা ইসলামের স্বর্ণযুগে জ্ঞানচর্চার বিস্তৃত পরিসরকে নির্দেশ করে।

বর্তমানে সৌদি আরব ইসলামি শিক্ষার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে বিবেচিত। এখানে অবস্থিত মদিনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (Islamic University of Madinah), উম্ম আল-কুরা বিশ্ববিদ্যালয় (Umm al-Qura University) এবং ইমাম মুহাম্মদ ইবনে সৌদ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (Imam Muhammad ibn Saud Islamic University) আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য শরিয়াহ, হাদিস, তাফসির ও আরবি ভাষা শিক্ষায় বিশেষায়িত কোর্স প্রদান করে। এসব প্রতিষ্ঠানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শিক্ষার্থীরা এসে অধ্যয়ন করে এবং অনেক ক্ষেত্রেই পূর্ণ স্কলারশিপ সুবিধা পায়।

মধ্যপ্রাচ্যের অন্যান্য দেশেও আধুনিক ইসলামি শিক্ষার বিস্তার ঘটেছে। কাতারের কাতার বিশ্ববিদ্যালয় (Qatar University), সংযুক্ত আরব আমিরাতের শারজাহ বিশ্ববিদ্যালয় (University of Sharjah) এবং ফিলিস্তিনের গাজা ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় (Islamic University of Gaza) ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও সামাজিক বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে।

বিশ্বের বৃহত্তম মুসলিম জনসংখ্যার দেশ ইন্দোনেশিয়ার উত্তর সুমাত্রার মুহাম্মদিয়াহ বিশ্ববিদ্যালয় (Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara) এবং আহমদ দাহলান বিশ্ববিদ্যালয় (Universitas Ahmad Dahlan) আধুনিক ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে।

আফ্রিকা মহাদেশেও ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তার লক্ষ্য করা যায়। উগান্ডার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় (Islamic University in Uganda) এবং এবং নাইজারের ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয় (Islamic University Niger) আঞ্চলিক পর্যায়ে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করেছে। এসব প্রতিষ্ঠান মূলত ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা-ওআইসি-এর পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হয় এবং স্থানীয় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্যও উন্মুক্ত।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা উন্নয়নকে লক্ষ্য করে ইসলামী সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি) ১৯৭০-এর দশক থেকে ধারাবাহিকভাবে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৭৭ সালে সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়–মালয়েশিয়া, পাকিস্তান ও বাংলাদেশে তিনটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা। এই সিদ্ধান্তের ধারাবাহিকতায় ১৯৮৩ সালে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাকার্যক্রম শুরু হয়।

মালয়েশিয়ায় প্রতিষ্ঠিত ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি মালয়েশিয়া (International Islamic University Malaysia) এবং পাকিস্তানের ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি ইসলামাবাদ (International Islamic University Islamabad) দ্রুতই আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা, পরিকল্পিত একাডেমিক কাঠামো এবং বৈশ্বিক সংযোগের কারণে এ দু'টি বিশ্ববিদ্যালয় মুসলিম বিশ্বের ইসলামি শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

অন্যদিকে, বাংলাদেশের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ (Islamic University, Bangladesh) প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নানা জটিলতা ও নীতিগত অসঙ্গতির মুখে পড়ে। বিশ্ববিদ্যালয়টির অবস্থান নির্ধারণ নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক, প্রশাসনিক অস্থিরতা এবং বারবার স্থানান্তরের মতো সিদ্ধান্ত এর স্বাভাবিক বিকাশে বাধা সৃষ্টি করে। প্রথমদিকে রাজধানীর নিকটবর্তী স্থানে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা থাকলেও পরবর্তীতে কুষ্টিয়াকে স্থান হিসেবে নির্ধারণ করা হয়। পরে সামরিক শাসনামলে এটিকে ঢাকায় স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং ১৯৮৬ সালে ঢাকার অদূরে একাডেমিক কার্যক্রম শুরু হয়। কিন্তু মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে আবারও তা স্থানান্তর করে কুষ্টিয়ায় নিয়ে যাওয়া হয়।

এই ধারাবাহিক অস্থিরতা ও নীতিগত বিচ্যুতির ফলে বিশ্ববিদ্যালয়টির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয় এবং আন্তর্জাতিক মানের একটি ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে গড়ে ওঠার সুযোগ ক্ষুণ্ন হয়। ফলে যেখানে ওআইসি'র সুপারিশে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয় বৈশ্বিক পরিসরে কার্যকর ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে, সেখানে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠানটি সেই মানদণ্ডে পৌঁছাতে পারেনি।

সম্মেলনের সীমাবদ্ধতা ও বাস্তবতা

ওআইসি'র উদ্যোগের একটি বড় সীমাবদ্ধতা ছিল সুপারিশ বাস্তবায়নে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর ওপর কার্যকর চাপ প্রয়োগ করতে না পারা। পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ফলোআপ সম্মেলনে প্রাথমিক থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত একটি সমন্বিত শিক্ষা কাঠামোর রূপরেখা প্রণয়ন করা হলেও অধিকাংশ দেশ তা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়নি। বাংলাদেশেও সেই সুপারিশ অনুযায়ী একটি সমন্বিত ইসলামি শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

বর্তমান বৈশ্বিক বাস্তবতায় একটি কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে হলে ধর্মীয় জ্ঞান, আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিগত দক্ষতার সমন্বয় অপরিহার্য। একটি আদর্শ বিশ্ববিদ্যালয় কাঠামোতে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো গুরুত্ব পেতে পারে:

প্রথমত, সকল শিক্ষার্থীর জন্য নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ ও নিজ নিজ ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক পরিচিতি সম্পর্কিত মৌলিক কোর্স থাকা প্রয়োজন। মুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য ইসলামি আকিদা, কুরআন-সুন্নাহ পরিচিতি, নবী জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে; অন্যদিকে অমুসলিম শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প নৈতিকতা ও মানবিক শিক্ষা রাখা যেতে পারে।

দ্বিতীয়ত, বিশেষায়িত শিক্ষার সুযোগ উন্মুক্ত রাখতে হবে–ইসলামি আইন, অর্থনীতি, ইতিহাসের পাশাপাশি আধুনিক সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও সাংবাদিকতার মতো বিষয়গুলো সমান গুরুত্ব পাবে।

তৃতীয়ত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। গণিত, পদার্থবিজ্ঞান, প্রকৌশল, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতে দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তোলা ছাড়া কোনো জাতির টেকসই উন্নয়ন সম্ভব নয়।

চতুর্থত, ইন্টারডিসিপ্লিনারি শিক্ষার ওপর জোর দিয়ে শিক্ষার্থীদের বহুমাত্রিক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড অনুযায়ী ক্রেডিটভিত্তিক কোর্স কাঠামো (১৩০-১৬০ ক্রেডিট আওয়ার) অনুসরণ করা যেতে পারে।

উপসংহারে বলা যায়, মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা সংস্কারের যে স্বপ্ন ওআইসি দেখিয়েছিল, তা আংশিক সফল হলেও পূর্ণ বাস্তবায়ন সম্ভব হয়নি। বাংলাদেশের মতো দেশে, যেখানে জনসংখ্যার বড় অংশ মুসলিম, সেখানে একটি সমন্বিত, আধুনিক ও মূল্যবোধনির্ভর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা সময়ের দাবি। এজন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সদিচ্ছা, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা এবং আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক সংস্কার। ■

শিক্ষাসংস্কারের উপযুক্ত সময় এখনই

মুহাম্মদ আবদুল আজিজ, পিএইচডি
শিক্ষাবিদ, গবেষক ও শিক্ষা-উদ্যোক্তা
মহাপরিচালক, বিআইটি

স্বাধীনতার পর থেকে বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে বহু শিক্ষানীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়েছে। সবই ছিল শাসকগোষ্ঠীর চিন্তা-চেতনাকে সাধারণ জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস। এসব নীতিতে দেশের সংস্কৃতি, মূল্যবোধ, ও দর্শনকে যথ যথভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এর ফলে পাঠ্যক্রমে খেয়ালখুশিমতো পরিবর্তন, রাষ্ট্রীয় অর্থের অপচয়, এবং অপরিণামদর্শী সিদ্ধান্তের কারণে শিক্ষাব্যবস্থা প্রায় ধ্বংসের পথে দাঁড়িয়েছে।

শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার ও পুনর্গঠন অন্যতম অগ্রাধিকার পাওয়া প্রয়োজন। জাতি গঠনের প্রধান নিয়ামক হিসেবে এ প্রজন্মের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত ভবিষ্যতের জন্য একটি শক্তিশালী ও কার্যকর শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তোলা। জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ মানবিকতা, যুক্তিবাদ, অসাম্প্রদায়িকতা ও দেশপ্রেমের আদর্শ তুলে ধরা হলেও

শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি শিক্ষিত, নৈতিক ও দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিক্ষাদর্শন, ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। দেশীয় সত্তা ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন, দক্ষ ও ভালো মানুষ গড়ে তোলাই প্রাধান্য পাওয়া জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত

তা বাস্তবে কার্যকর হয়নি, বরং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের সমন্বয়হীন একটি সেকেলে শিক্ষাব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০১২ সালের জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশলে নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হলেও তার বাস্তবায়নও সফল হয়নি। ২০২১ সালে চালু করা জাতীয় শিক্ষাক্রম রূপরেখা নীতিনির্ধারণে অদূরদর্শিতার ও জাতিসত্তার সাথে সাংঘর্ষিক উপাদান থাকায় এটিও ব্যর্থ হয়েছে। এ ছাড়াও উচ্চশিক্ষার লক্ষ্যে বিগত সরকারের গৃহীত সংশোধিত কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা (২০১৮-২০৩০) এর ক্রিটিক্যাল রিভিও প্রয়োজন।

এমতাবস্থায়, শিক্ষাব্যবস্থার পুনর্গঠনের মাধ্যমে একটি শিক্ষিত, নৈতিক ও দক্ষ প্রজন্ম গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের সবার। শিক্ষা সংস্কারের লক্ষ্যে নতুন শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ঐকমত্যের ভিত্তিতে শিক্ষাদর্শন, ভিশন, মিশন এবং উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য ঠিক করতে হবে। দেশীয় সত্তা ও মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিয়ে কল্যাণমুখী রাষ্ট্র বিনির্মাণে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধসম্পন্ন, দক্ষ ও ভালো মানুষ গড়ে তোলাই প্রাধান্য পাওয়া জাতীয় শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। শিক্ষায় যেকোনো পরিকল্পনা বাস্তবায়নে শহর-গ্রামীণ ভেদাভেদ দূর করে ভারসাম্যপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগোষ্ঠী এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কথা বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়ে, তাদের জন্য শিক্ষাবাজেটে অগ্রাধিকার নীতি চালু করতে হবে।

বিগত বছরগুলোতে উচ্চশিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে বিধায় উচ্চশিক্ষার মান ধরে রাখার জন্য সংখ্যা না বাড়িয়ে গুণগত মানের দিকে নজর দেওয়া উচিত। এ লক্ষ্যে রাজধানী ঢাকা ও জেলা শহরগুলোর পরিবর্তে বিভাগীয় শহরে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন/আনুমোদন দেওয়া যেতে পারে। দেশের শ্রমবাজার এবং বিশ্বশ্রমবাজারে জনশক্তি রপ্তানির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহে ডিপ্লোমা চালু করা উচিত, যাতে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা যায়। এ ছাড়া কারিগরি ধারায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ বৃদ্ধি করার জন্য কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সম্প্রসারণ, গবেষণা কার্যক্রম এবং শিক্ষার মানোন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ নিতে হবে। এ লক্ষ্যে জেলাভিত্তিক প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সমূহকে কারিগরি শিক্ষার বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর করা উচিত।

দেশের কিছু বিশ্ববিদ্যালয়কে পুরোপুরি গবেষণানির্ভর বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করার পাশাপাশি সকল বিশ্ববিদ্যালয়কে ৬০% শিখননির্ভর এবং ৪০% গবেষণানির্ভর প্রতিষ্ঠানে উন্নীত করা দরকার। বাংলাদেশ প্রধানত কৃষিনির্ভর দেশ। তাই, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাকার্যক্রম সম্প্রসারণ করে উন্নত গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ব্যাপক ভিত্তিতে অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং সরকারি-বেসরকারি বিনিয়োগ বৃদ্ধি করতে হবে। ১ম- ৪র্থ আন্তর্জাতিক মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনে গৃহীত (১৯৭৭-১৯৮৩) মক্কা ডিক্লেয়ারেশনে স্বাক্ষরকারী দেশ হিসেবে বাংলাদেশ গৃহীত সুপারিশসমূহ বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করেছে- যা পরিপূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করা হয়নি। তাই সংশ্লিষ্টরা অবশ্যই সেই ডিক্লেয়ারেশনে গৃহীত সুপারিশমালার বাস্তবায়নে দ্রুত পদক্ষেপ নিবে।

পাঠ্যক্রমে পরিবর্তনের ব্যাপারেও গুরুত্ব দেওয়া দরকার। সকল ধারার শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায়ে কিছু সাধারণ বিষয় বাধ্যতামূলকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যা ইংরেজি মাধ্যম, বাংলা মাধ্যম, আলিয়া মাদ্রাসা বা কওমী মাদ্রাসা- সব ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হবে। এসব বিষয়ের মধ্যে থাকবে: বাংলাদেশ পরিচিতি, ইতিহাস ও সভ্যতা, সামাজিক বিজ্ঞান এবং ধর্মশিক্ষা। পাশাপাশি ভাষাগত দক্ষতা ও কম্পিউটার দক্ষতা অর্জনকেও বাধ্যতামূলক করতে হবে। জাতীয় শিক্ষাক্রমে অবশ্যই বাংলা, ইংরেজি ও আরবি- তিনটি ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে। আরবি পৃথিবীর অন্যতম সমৃদ্ধ ভাষা, একই সাথে দেশের একটি বিশাল জনশক্তি মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে কর্মরত। সকল স্তরের পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যসূচিতে জীবনমুখী দক্ষতা এবং বিষয়ভিত্তিক, সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের যথাযথ সমন্বয় নিশ্চিত করতে হবে।

জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থায় সকল স্তরে 'ফান্ডামেন্টালস অব রিলিজিয়ন' তথা মুসলিমদের জন্য 'ফান্ডামেন্টালস অব ইসলাম' বিষয় বাধ্যতামূলক করতে হবে। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে প্রতিটি বিষয়ের সাথে 'প্রাসঙ্গিক ধর্মীয় কোর্স' বাধ্যতামূলক করতে হবে। যেমন অর্থনীতিতে

ইসলামী অর্থনীতি, রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ইসলামী রাষ্ট্রচিন্তা, আইনে ইসলামিক লিগ্যাল থিওরি ইত্যাদি। আমাদের দেশের শিল্প ও অর্থনৈতিক পরিকাঠামোর সাথে মিল রেখে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বিভাগ চালু ও শিক্ষা কারিকুলাম প্রণয়ন করা, যাতে আমাদের দেশকে ভিন্ন দেশ থেকে লোক নিয়োগ করতে না হয়। যে বিষয়ে আমাদের দক্ষ জনশক্তি দরকার, সেই পরিমাণ জনশক্তি তৈরিতে ব্যর্থ হচ্ছে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা। এ ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষায় করপোরেট ইন্টারেস্টে সংযুক্ত অপ্রয়োজনীয় পাঠ্যবিষয়গুলো বাদ দিয়ে সোশ্যাল ইন্টারেস্টে প্রয়োজনীয় নতুন বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। একই সাথে শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য রেখে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে যেসব বিষয়ের বাস্তব প্রয়োগ নেই, সেগুলোকে ধীরে ধীরে অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ের সাথে একীভূত করে বিলুপ্ত করতে হবে।

কওমী মাদ্রাসায় ভালো আলেম গড়ার লক্ষ্য নিয়ে এবং কওমী শিক্ষাব্যবস্থার স্বকীয়তা বজায় রেখে সিলেবাসকে যুগোপযোগী করে গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে কওমী শিক্ষাবোর্ডকে ও অন্যান্য বোর্ডের মতো ক্ষমতায়িত করে শিক্ষকদের শিখনদক্ষতা বাড়াতে হবে এবং দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনায় শিক্ষকদের সরকারি এমপিওভুক্তি করা যেতে পারে। আলিয়া ও কওমী মাদ্রাসা শিক্ষায় শিক্ষিতদের মূলধারায় সমাজ ও রাষ্ট্র পরিচালনায় যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাদ্রাসার ইসলামী বিষয়ের সাথে সমাজবিজ্ঞান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি এবং বাধ্যতামূলকভাবে ভাষা ও তথ্যপ্রযুক্তি দক্ষতা অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। পাশাপাশি মাদ্রাসা শিক্ষায় কারিগরি শিক্ষা ব্যাপকভাবে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। মাদ্রাসা শিক্ষায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করা এবং সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে গবেষণার ক্ষেত্রও তৈরি করতে হবে।

শিক্ষাসংস্কারে শিক্ষক প্রশিক্ষণও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সকল স্তরের শিক্ষকদের জন্য পেডাগজি স্কিলস বা আর্ট অব টিচিং- এর পাশাপাশি বিষয়ভিত্তিক পাঠদান পদ্ধতির ওপর শিক্ষণপ্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের জন্য জাতীয়ভাবে পৃথক প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট চালু করতে হবে, যেখানে শিক্ষকদের প্রি-সার্ভিস ও ইন-সার্ভিস প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসতে হবে। এছাড়া ঐ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষকদের বাধ্যতামূলক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিদেশি ডিগ্রীধারী হতে হবে। প্রাথমিক স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত শিক্ষকদের সবার জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেলের মাধ্যমে শিক্ষকদের উপযুক্ত বেতন ও সামাজিক মর্যাদা নিশ্চিত করতে হবে। এ ছাড়া মেধাবীরা যাতে শিক্ষকতাকে পেশা হিসেবে বেছে নিতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন; এ লক্ষ্যে বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস কমিশন (বিজেএসসি) ও বাংলাদেশ কর্ম কমিশন (পিএসসি) এর আদলে 'এডুকেশন সার্ভিস কমিশন (ইএমসি)' গঠন করতে হবে, যা অন্যান্য কর্মক্ষেত্রের তুলনায় সামঞ্জস্যপূর্ণ ও বৈষম্যবিহীন হবে।

মূল্যায়ন-সংক্রান্ত বিবেচনায়ও পরিবর্তন আনতে হবে। সব লেভেলের শিক্ষার্থীদের মূল্যায়ন পদ্ধতিতে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান, ব্যবহারিক দক্ষতা, সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক মূল্যবোধের প্রতিফলন নিশ্চিত করতে হবে। মূল্যায়ন এমন হতে পারে: বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান ৫০%, বিশেষায়িত জ্ঞান ২০%, জীবনমুখী দক্ষতা ১০%, নীতিনৈতিকতা ও মূল্যবোধ ১০%, পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মাঝে স্বেচ্ছাসেবামূলক কাজ ১০%। সব লেভেলের শিক্ষক মূল্যায়নেও অনুরূপ/ কাছাকাছি ব্যবস্থা থাকা বাঞ্ছনীয়। বিশ্ববিদ্যালয় লেভেলের শিক্ষকদের টিচিং ও গবেষণায় যথাক্রমে নূন্যতম ৬০% ও ৪০% হারে মূল্যায়ন ব্যবস্থা থাকা দরকার।

ব্যবস্থাপনায় নতুন ধারা চালু করতে হবে। সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রধানদের অবশ্যই স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এডুকেশনাল ম্যানেজমেন্ট এন্ড লিডারশীপে ডিগ্রি থাকতে হবে। সকল স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনা পর্ষদ এবং ব্যবস্থাপনায় বাধ্যতামূলকভাবে শিক্ষানুরাগী শিক্ষক-শিক্ষাবিদ সদস্য, দাতা সদস্যের বাইরে উদ্যোক্তা-প্রতিষ্ঠাতা সদস্য অন্তর্ভুক্ত থাকতে হবে। এ ছাড়া একজন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বকে কমিটিতে আওতাভুক্ত করা উচিত। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও ইসলামী আরবি বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অধিভুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের মান কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ ও মনিটরিং-এর ব্যবস্থা করা যাতে যত্রতত্র কলেজ-মাদ্রাসা গড়ে উঠতে না পারে এবং দক্ষ গ্র্যাজুয়েট বের হতে পারে।

এছাড়া স্কুল থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়সহ শিক্ষার সব স্তরের শিক্ষকদের সরাসরি দলীয় রাজনীতির চর্চায় যুক্ত থাকাকে সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে। শিক্ষকতা পেশায় জড়িতদের সরাসরি রাজনৈতিক কার্যক্রমে অংশগ্রহণের চেয়ে লেখাপড়া, গবেষণা ও জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় মনোযোগী হওয়া জরুরি। শিক্ষার্থীদেরও দলীয় লেজুরবৃত্তির ছাত্ররাজনীতি বন্ধ করে পড়াশোনা, আত্মগঠন, দক্ষতার উন্নয়ন ও বুদ্ধিবৃত্তিক চর্চায় গুরুত্ব দেওয়া দরকার।

সর্বোপরি জাতীয় শিক্ষাব্যবস্থার সংকট মোকাবিলায় দ্রুত শিক্ষাসংস্কার কমিশন গঠন, পরবর্তীতে স্থায়ী জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে। যেখানে শিক্ষানীতি, শিক্ষাক্রম, পাঠ্যক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থাপনায় বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিত্ব, দেশের শিল্প এবং শ্রমবাজারের সাথে পরিচিত ব্যক্তিত্ব এবং ধর্মীয় ব্যক্তিত্বের অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করতে হবে। কেবলমাত্র নির্দিষ্ট ভিশন ও সুদৃঢ় কমিটমেন্টে ধারাবাহিক প্রচেষ্টার মাধ্যমেই এ লক্ষ্য অর্জন করা সম্ভব। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন উদ্যোগ পরিলক্ষিত হচ্ছে, তবুও সমন্বিত শিক্ষাকার্যক্রমের পথে এখনও বহু বাধা-বিপত্তি রয়েছে; যা অনতিবিলম্বে, স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি- এ তিন ধাপে বাস্তবায়ন করা যেতে পারে। শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কারের কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া ছাড়া বিকল্প কোনো পথ নেই। ■

বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক কৌশল

মাসুমুর রহমান খলিলী
সিনিয়র সাংবাদিক ও আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশ্লেষক

বাংলাদেশের ভূ-রাজনৈতিক অবস্থান বর্তমান ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্তরে উপনীত হয়েছে। বঙ্গোপসাগরের কৌশলগত নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মিলনস্থল হিসেবে বাংলাদেশ এখন বৈশ্বিক শক্তিগুলোর (ভারত, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র) মনোযোগের কেন্দ্রে।

নিচে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ও ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের প্রধান দিকগুলো আলোচনা করা হলো:

১. নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল (২০২৬)

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ একটি নতুন জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করেছে। এর মূল লক্ষ্য হলো:

সশস্ত্র বাহিনীর আধুনিকায়ন: প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী করতে প্রযুক্তিগত সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং নিয়মিত যৌথ সামরিক মহড়ার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশের সাথে কৌশলগত সম্পর্ক উন্নয়ন।

অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা: রাজনৈতিক মেরুকরণ কাটিয়ে উঠে জাতীয় ঐক্য বজায় রাখা, যা আন্তর্জাতিক দরকষাকষিতে বাংলাদেশের অবস্থান শক্তিশালী করবে।

২. কৌশলগত সংযোগ (Strategic Connectivity)

বাংলাদেশ নিজেকে একটি আঞ্চলিক কানেক্টিভিটি হাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছে:

মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর: ২০২৬ সালের মধ্যে এই বন্দরের সড়ক যোগাযোগ (ফাসিয়াখালী সংযোগ) সম্পন্ন হওয়ার লক্ষ্য রয়েছে। এটি শুধু বাংলাদেশের জন্য নয়, বরং ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল (সেভেন সিস্টার্স), নেপাল এবং ভুটানের জন্য প্রধান ট্রানজিট পয়েন্ট হতে পারে।

বিসিআইএম অর্থনৈতিক করিডোর: বাংলাদেশ, চীন, ভারত ও মিয়ানমারকে যুক্ত করে যে করিডোর তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে, তাতে বাংলাদেশ একটি গুরুত্বপূর্ণ 'নোড' হিসেবে কাজ করছে। এটি কুনমিং থেকে চট্টগ্রাম ও মোংলা বন্দর পর্যন্ত মাল্টিমোডাল সংযোগ স্থাপনে সহায়ক হবে।

৩. ভারসাম্যের কূটনীতি (Balancing Act)

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি 'ত্রিমুখী কৌশলগত চাপে'র মধ্য দিয়ে যাচ্ছে:

ভারত ও যুক্তরাষ্ট্র: নিরাপত্তা ও গণতন্ত্রের প্রশ্নে এই দেশগুলোর সাথে ঘনিষ্ঠতা বাড়ছে, বিশেষ করে ইন্দো-প্যাসিফিক কৌশলে বাংলাদেশের গুরুত্ব অপরিসীম।

চীন: অবকাঠামোগত উন্নয়ন এবং অর্থনৈতিক বিনিয়োগের জন্য চীনের ওপর নির্ভরশীলতা বজায় রাখতে হচ্ছে। বিআরআই (Belt and Road Initiative) প্রকল্পের মাধ্যমে চীন বাংলাদেশের জ্বালানি ও যোগাযোগ খাতে বড় অংশীদার।

কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন: কোনো নির্দিষ্ট ব্লকের দিকে না ঝুঁকে 'সবার সাথে বন্ধুত্ব' নীতি বজায় রেখে নিজস্ব স্বার্থ রক্ষা করাই এখন প্রধান চ্যালেঞ্জ।

৪. নীল অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি (Blue Economy)

বঙ্গোপসাগরের বিশাল সমুদ্রসীমা জয়ের পর এখন এর অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা বাংলাদেশের বড় অগ্রাধিকার:

সমুদ্রসীমা রক্ষা: কোস্টগার্ড ও নৌবাহিনীর সক্ষমতা বাড়িয়ে সমুদ্রপথে চোরাচালান ও বিদেশি অনুপ্রবেশ রোধ করা।

সম্পদ আহরণ: সমুদ্রতলের গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আহরণে বিদেশি বিনিয়োগ আকর্ষণ এবং টেকসই সমুদ্র নীতিমালা বাস্তবায়ন।

৫. আঞ্চলিক চ্যালেঞ্জ ও মিয়ানমার সীমান্ত

মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ অস্থিরতা এবং আরাকান আর্মির সাথে সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষ বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। রোহিঙ্গা সংকট সমাধান এবং সীমান্তে স্থিতিশীলতা রক্ষা করা ২০২৬ সালের ভূ-রাজনৈতিক কৌশলের একটি অন্যতম জটিল অংশ।

বাংলাদেশের বর্তমান কৌশল হলো–অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য কানেক্টিভিটি ব্যবহার করা এবং নিরাপত্তার জন্য ভারসাম্যের কূটনীতি অনুসরণ করা। মাতারবাড়ী বন্দর এবং পদ্মা সেতুর মতো মেগা প্রকল্পগুলো এই কৌশলগত সংযোগকে বাস্তব রূপ দিচ্ছে।

দুই.

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার প্রেক্ষাপটে পার্বত্য চট্টগ্রাম, রোহিঙ্গা সংকট এবং তথাকথিত 'বঙ্গভূমি' বা উগ্রবাদ ইস্যুগুলো অত্যন্ত সংবেদনশীল এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ২০২৬ সালের বর্তমান ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই বিষয়গুলো অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতার পাশাপাশি আঞ্চলিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও বড় চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নিচে এই প্রভাবগুলোর একটি বিশদ বিশ্লেষণ দেওয়া হলো:

১. রোহিঙ্গা সংকট ও দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা ঝুঁকি

রোহিঙ্গা ইস্যুটি এখন আর কেবল মানবিক সমস্যা নয়, এটি বাংলাদেশের জন্য একটি দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা সংকটে পরিণত হয়েছে।

সীমান্ত উত্তেজনা: মিয়ানমারের অভ্যন্তরে জান্তা বাহিনী এবং আরাকান আর্মির মধ্যকার চলমান যুদ্ধ বাংলাদেশের সীমান্ত নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বের ওপর চাপ সৃষ্টি করছে।

উগ্রবাদের বিস্তার: দীর্ঘদিনের অনিশ্চয়তা ও শিবিরের মানবেতর জীবন পরিস্থিতি উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোকে সেখানে তাদের নেটওয়ার্ক বিস্তারের সুযোগ করে দিতে পারে। এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলার জন্য বড় হুমকি।

আন্তঃদেশীয় অপরাধ: মাদক (বিশেষ করে ইয়াবা ও আইস) এবং মানবপাচারের প্রধান রুট হিসেবে এই অঞ্চলটি ব্যবহৃত হওয়ায় একটি অস্থিতিশীল চক্র তৈরি হচ্ছে।

২. পার্বত্য চট্টগ্রাম (CHT) ও আঞ্চলিক অস্থিরতা

পার্বত্য চট্টগ্রামের ভৌগোলিক অবস্থান বাংলাদেশ, ভারত ও মিয়ানমার–এই তিন দেশের সংযোগস্থলে হওয়ায় এর কৌশলগত গুরুত্ব অপরিসীম।

সশস্ত্র গোষ্ঠীর তৎপরতা: কেএনএফ (KNF) বা ইউপিডিএফ-এর মতো গোষ্ঠীগুলোর সশস্ত্র কর্মকাণ্ড পার্বত্য অঞ্চলে নতুন করে উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। এদের বহিঃশক্তির সাথে সম্ভাব্য সংযোগ জাতীয় নিরাপত্তার জন্য উদ্বেগের কারণ।

সীমান্ত পারাপার ও আশ্রয়: দুর্গম পাহাড়ি অঞ্চলের সুবিধা নিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী গোষ্ঠীগুলো সীমান্তের ওপারে যাতায়াত করতে পারে, যা প্রতিবেশী দেশগুলোর সাথে কূটনৈতিক জটিলতা তৈরি করে।

উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা: সরকার এখানে পর্যটন ও অবকাঠামোগত উন্নয়ন চাইলেও নিরাপত্তার অভাব বিনিয়োগকে বাধাগ্রস্ত করছে।

৩. 'বঙ্গভূমি' ও বিচ্ছিন্নতাবাদী ধারণা

'বঙ্গভূমি'র মতো বিচ্ছিন্নতাবাদী বা সাম্প্রদায়িক এজেন্ডাগুলো সরাসরি বাংলাদেশের ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতার পরিপন্থী।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট: এ ধরনের কাল্পনিক বা উস্কানিমূলক প্রচারণা দেশের সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট করতে ব্যবহৃত হতে পারে, যা অভ্যন্তরীণ দাঙ্গা বা অস্থিরতার সূত্রপাত ঘটায়।

জাতীয় নিরাপত্তায় সামগ্রিক প্রভাব		
ইস্যু	**প্রধান ঝুঁকি**	**কৌশলগত প্রভাব**
রোহিঙ্গা	সশস্ত্র গোষ্ঠী ও মাদক চোরাচালান	আন্তর্জাতিক সম্পর্কে টানাপোড়েন ও জনমিতিক পরিবর্তন
পার্বত্য চট্টগ্রাম	বিচ্ছিন্নতাবাদ ও অভ্যন্তরীণ বাস্তুচ্যুতি	অবকাঠামোগত উন্নয়নের ধীরগতি ও সীমান্ত অস্থিতিশীলতা
উগ্রবাদ	সাম্প্রদায়িক সহিংসতা ও বৈশ্বিক বদনাম	বিনিয়োগ ও পর্যটন খাতের ক্ষতি
বঙ্গভূমি	ভূ-খণ্ডগত অখণ্ডতা হ্রাস	প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে আস্থার সংকট

ভূ-রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র: অনেক সময় বহিঃশক্তির মদদপুষ্ট হয়ে এ ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনগুলো দেশের সার্বভৌমত্বকে দুর্বল করার চেষ্টা করে। গোয়েন্দা নজরদারি ও রাজনৈতিক সচেতনতা এখানে প্রধান প্রতিরক্ষা।

৪. উগ্রবাদ ও উগ্রপন্থার বিবর্তন

উগ্রবাদী গোষ্ঠীগুলোর কৌশল বর্তমানে শারীরিক অবস্থান থেকে সরে গিয়ে অনলাইন ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধের দিকে মোড় নিয়েছে।

ডিজিটাল র‍্যাডিকালাইজেশন: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে তরুণদের মগজ ধোলাই এবং উগ্রপন্থায় উদ্বুদ্ধ করার হার বেড়েছে। এটি প্রতিরোধ করা আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর জন্য বড় একটি কারিগরি চ্যালেঞ্জ।

অর্থনৈতিক প্রভাব: উগ্রবাদের বিস্তার সরাসরি বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) এবং উন্নয়ন প্রকল্পের ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে, যা দেশের সামষ্টিক অর্থনৈতিক নিরাপত্তাকে ঝুঁকিতে ফেলে।

বর্তমান কৌশল ও করণীয়

বাংলাদেশ বর্তমানে 'শূন্য সহনশীলতা' (Zero Tolerance Policy) নীতি অনুসরণ করছে। জাতীয় নিরাপত্তাকে সুসংহত করতে সশস্ত্র বাহিনী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলো প্রযুক্তিনির্ভর নজরদারি বাড়িয়েছে। বিশেষ করে মিয়ানমার সীমান্তে ড্রোন ও আধুনিক নজরদারি ব্যবস্থার ব্যবহার বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইসাথে, কূটনৈতিকভাবে চীন ও ভারতের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখা হচ্ছে যাতে সীমান্ত সজ্ঞাত বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ছড়িয়ে না পড়ে।

তিন.

বৃহৎ শক্তিগুলোর সাথে বাংলাদেশের কৌশলগত সম্পর্কের প্রভাব এবং এর ফলে উদ্ভূত জাতীয় নিরাপত্তা পরিস্থিতির একটি গভীর বিশ্লেষণ নিচে তুলে ধরা হলো। ২০২৬ সালের বর্তমান বাস্তবতায় এই সমীকরণগুলো আগের চেয়ে অনেক বেশি জটিল।

১. যুক্তরাষ্ট্র-বাংলাদেশ: নতুন বাণিজ্যিক ও নিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্ক

২০২৬ সালের শুরুতে যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের মধ্যে 'এগ্রিমেন্ট অন রেসিপ্রোকাল ট্রেড' (ART) স্বাক্ষরিত হওয়া একটি ঐতিহাসিক মোড়।

প্রভাব: এর ফলে একদিকে যেমন নির্দিষ্ট বাংলাদেশি পণ্যে শূন্য শতাংশ ট্যারিফ সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশে বড় ধরণের বাজার সুবিধা পেয়েছে। এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্তিশালী করছে, যা পরোক্ষভাবে জাতীয় নিরাপত্তাকে সুসংহত করে।

নিরাপত্তা সমীকরণ: এই চুক্তির আওতায় বাংলাদেশ 'ফোর্সড লেবার' বা জবরদস্তিমূলক শ্রম রোধ এবং ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এই বাধ্যবাধকতাগুলো পূরণ করা এখন জাতীয় স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য অপরিহার্য।

২. চীন: অবকাঠামো ও 'ডেড সাস্টেইনেবিলিটি' (ঋণ স্থায়িত্ব)

চীন বাংলাদেশের বৃহত্তম বাণিজ্যিক অংশীদার এবং সামরিক সরঞ্জামের প্রধান উৎস।

কৌশলগত সংযোগ: মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্র বন্দর এবং বিএনএস শেখ হাসিনা সাবমেরিন বেস-এর মতো প্রকল্পে চীনের ভূমিকা বাংলাদেশকে সামুদ্রিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হতে সাহায্য করছে।

ঋণের ঝুঁকি: ২০২৬ সালের সাম্প্রতিক রিপোর্ট অনুযায়ী, বাংলাদেশের বৈদেশিক ঋণের জিডিপি অনুপাত কিছুটা সহনীয় পর্যায়ে (declining path) থাকলেও চীনা ঋণের সুদ ও কিস্তি পরিশোধের চাপ একটি কৌশলগত দুশ্চিন্তার কারণ। তবে বর্তমান জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল অনুযায়ী, বাংলাদেশ চীনের সাথে একটি মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি (FTA) নিয়ে আলোচনা করছে যা ২০২৮ সাল নাগাদ রপ্তানি সুবিধা নিশ্চিত করবে।

৩. ভারত: স্থিতিশীলতা ও আঞ্চলিক ভারসাম্য

ভারতের জন্য বাংলাদেশ একটি অপরিহার্য নিরাপত্তা অংশীদার।

রাজনৈতিক ও নিরাপত্তা সংযোগ: ২০২৫-২৬ সময়কাল থেকে ভারত বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলোর (বিএনপি, জামায়াতসহ) সাথে সম্পর্ক উন্নয়ন ও সংলাপে যুক্ত হয়েছে। এটি বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে ভারতের পরিবর্তিত এবং আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক কৌশল নির্দেশ করে।

ট্রানজিট ও কানেক্টিভিটি: ভারতের সেভেন সিস্টার্স রাজ্যে পণ্য পরিবহনের সুবিধা বাংলাদেশকে ভূ-রাজনৈতিকভাবে অপরিহার্য করে তুলেছে। এর ফলে ভারতের ওপর বাংলাদেশের এক ধরণের 'লিভারেজ' বা দরকষাকষির

বৃহৎ শক্তির প্রভাব ও নিরাপত্তা ব্যবচ্ছেদ (২০২৬)		
রাষ্ট্র	**প্রধান সহযোগিতার ক্ষেত্র**	**জাতীয় নিরাপত্তার প্রভাব**
যুক্তরাষ্ট্র	উচ্চ প্রযুক্তি ও মুক্ত বাণিজ্য (ART)	শ্রম অধিকার ও গণতান্ত্রিক স্থিতিশীলতার চাপ
চীন	সামরিক সক্ষমতা ও অবকাঠামো	ঋণ ব্যবস্থাপনা ও দীর্ঘমেয়াদী কৌশলগত নির্ভরতা
ভারত	গোয়েন্দা সহযোগিতা ও ট্রানজিট	সীমান্ত নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা

ক্ষমতা তৈরি হয়েছে।

৪. জাতীয় নিরাপত্তায় 'ত্রিমুখী' প্রতিযোগিতার প্রভাব

২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে বড় শক্তিগুলোর এই প্রতিযোগিতা বাংলাদেশকে কয়েকটি নির্দিষ্ট চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে:

সামরিক ভারসাম্য: যুক্তরাষ্ট্র চায় বাংলাদেশ যেন চীনের ওপর সামরিক নির্ভরতা কমায়। বিপরীতে, চীন চায় তাদের প্রযুক্তি ও অবকাঠামো দিয়ে বাংলাদেশকে নিজেদের বলয়ে রাখতে। বাংলাদেশ এখন 'মাল্টি-সোর্সিং' পলিসি ব্যবহার করে দুই পক্ষ থেকেই সুবিধা নিচ্ছে।

ইন্দো-প্যাসিফিক প্রতিযোগিতা: বঙ্গোপসাগর এখন আর শুধু বাণিজ্যের রুট নয়, এটি এখন যুক্তরাষ্ট্র-চীন প্রতিযোগিতার মূল কেন্দ্র। বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এই অঞ্চলে কোনো একটি শক্তির একচ্ছত্র আধিপত্য রোধ করা এবং নিরপেক্ষ থাকা অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে।

অর্থনৈতিক নিরাপত্তা: ২০২৫ সালের শেষ দিকে বাংলাদেশে বিদেশি বিনিয়োগ (FDI) প্রায় ২০০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়েছে। এই বিনিয়োগের উৎসগুলোর (যেমন- চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ) মধ্যে ভারসাম্য রাখা এখন অর্থনৈতিক নিরাপত্তার প্রধান শর্ত।

৫. ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU): অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও মানবাধিকোর সমীকরণ

বাংলাদেশের জন্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন কেবল একটি বাণিজ্যিক জোট নয়, এটি আমাদের অর্থনৈতিক নিরাপত্তার মূল ভিত্তি।

GSP+ এবং রপ্তানি স্থিতিশীলতা: বাংলাদেশ বর্তমানে এলডিসি (LDC) থেকে উত্তরণের পথে রয়েছে। ২০২৬ সালের এই সময়ে ইইউ-এর GSP+ সুবিধা নিশ্চিত করা আমাদের পোশাক খাতের জন্য জীবন-মরণ প্রশ্ন। যদি এই সুবিধা কোনো কারণে বাধাগ্রস্ত হয়, তবে ব্যাপক বেকারত্ব এবং অর্থনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে, যা সরাসরি জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি।

মানবাধিকার ও সুশাসন: ইইউ বাংলাদেশের নিরাপত্তা কৌশলে গণতন্ত্র, শ্রম অধিকার এবং মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার দেয়। তাদের দেওয়া 'রুল অব ল' বিষয়ক চাপ অনেক সময় অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে, যা সরকারকে ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থানে থাকতে বাধ্য করে।

জলবায়ু নিরাপত্তা: ইইউ-এর 'গ্রিন ডিল' এবং জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় সহায়তা বাংলাদেশের উপকূলীয় নিরাপত্তা ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় বড় ভূমিকা রাখছে।

৬. রাশিয়া: জ্বালানি ও প্রতিরক্ষা সক্ষমতা

ইউক্রেন যুদ্ধের পর বৈশ্বিক মেরুকরণ সত্ত্বেও রাশিয়ার সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কৌশলগত কারণে বজায় রাখতে হয়েছে।

রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র: এটি বাংলাদেশের ইতিহাসের সবচেয়ে বড় মেগা প্রকল্প। ২০২৬ সালের মধ্যে এই কেন্দ্রের পূর্ণ সক্ষমতায় উৎপাদন শুরু হওয়া জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তার জন্য এক বিশাল মাইলফলক। এটি দীর্ঘমেয়াদে আমদানিকৃত জ্বালানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে জাতীয় গ্রিডকে স্থিতিশীল করবে।

প্রতিরক্ষা ও প্রযুক্তি: রাশিয়ার কাছ থেকে কেনা সামরিক সরঞ্জাম (যেমন: মিগ-২৯, এমআই হেলিকপ্টার) আমাদের বিমান ও নৌবাহিনীর সক্ষমতার অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই যন্ত্রপাতির রক্ষণাবেক্ষণ এবং স্পেয়ার পার্টস সরবরাহ নিশ্চিত করা জাতীয় প্রতিরক্ষার জন্য অপরিহার্য।

খাদ্য ও সার নিরাপত্তা: রাশিয়া থেকে গম ও সার আমদানি আমাদের খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। বৈশ্বিক নিষেধাজ্ঞার মধ্যে রাশিয়ার সাথে বিকল্প মুদ্রায় (যেমন: ইউয়ান বা রুপি) লেনদেনের ব্যবস্থা করা বাংলাদেশের আর্থিক নিরাপত্তার একটি নতুন কৌশল।

চার.

ওআইসি (OIC)ভুক্ত দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক ঐতিহাসিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিকভাবে অত্যন্ত গভীর।

জাতীয় নিরাপত্তায় ইইউ ও রাশিয়ার প্রভাবের তুলনামূলক ছক		
ক্ষেত্র	**ইউরোপীয় ইউনিয়ন (EU)**	**রাশিয়া (Russia)**
মূল শক্তি	বিশাল রপ্তানি বাজার ও রেডিমেড গার্মেন্টস।	পারমাণবিক শক্তি ও ভারী সমরাস্ত্র।
নিরাপত্তা প্রভাব	অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক উন্নয়ন।	দীর্ঘমেয়াদী জ্বালানি ও খাদ্য নিরাপত্তা।
কৌশলগত ঝুঁকি	মানবাধিকার ইস্যুতে নিষেধাজ্ঞা বা বাণিজ্যিক শর্ত।	পশ্চিমা নিষেধাজ্ঞার কারণে লেনদেনে জটিলতা।
২০২৬-এর পরিস্থিতি	'এভরিথিং বাট আর্মস' (EBA) পরবর্তী উত্তরণ।	রূপপুর প্রকল্পের বাণিজ্যিক পরিচালনা শুরু।

২০২৬ সালের পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে এই সম্পর্ক এখন কেবল ভ্রাতৃত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, বরং এটি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা, জনশক্তি রপ্তানি এবং ভূ-রাজনৈতিক শক্তি অর্জনের একটি বড় হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

জাতীয় নিরাপত্তায় ওআইসি দেশগুলোর (বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্য) প্রভাব নিচে বিশ্লেষণ করা হলো:

১. অর্থনৈতিক ও রেমিট্যান্স নিরাপত্তা

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড বা রেমিট্যান্সের প্রধান উৎস হলো ওআইসিভুক্ত দেশগুলো (যেমন: সৌদি আরব, ইউএই, কাতার, কুয়েত)।

স্থিতিশীলতা: ২০২৬ সালের তথ্য অনুযায়ী, বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভের একটি বড় অংশ আসে মধ্যপ্রাচ্য থেকে। এই প্রবাহে কোনো বিঘ্ন ঘটলে তা সরাসরি জাতীয় মুদ্রাস্ফীতি ও অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতায় প্রভাব ফেলে।

জনশক্তি রপ্তানির বহুমুখীকরণ: ওআইসি দেশগুলোতে দক্ষ জনশক্তি পাঠিয়ে বাংলাদেশ তার বেকারত্ব সমস্যার সমাধান ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

২. জ্বালানি নিরাপত্তা (Energy Security)

বাংলাদেশের শিল্পায়ন ও জাতীয় উৎপাদন সচল রাখার জন্য ওআইসি দেশগুলোর ওপর নির্ভরতা অপরিহার্য।

জ্বালানি আমদানির নিশ্চয়তা: কাতার এবং সৌদি আরবের সাথে দীর্ঘমেয়াদী এলএনজি (LNG) ও তেল আমদানি চুক্তি বাংলাদেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। ২০২৬ সালের বিশ্ববাজারে জ্বালানির উচ্চমূল্যের মধ্যেও এই দেশগুলোর সাথে বিশেষ সম্পর্ক বাংলাদেশকে তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে জ্বালানি পেতে সহায়তা করছে।

বিনিয়োগ: সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাত বাংলাদেশের জ্বালানি ও অবকাঠামো খাতে বড় ধরণের বিনিয়োগ করছে, যা দেশের জাতীয় সক্ষমতা বাড়াচ্ছে।

৩. রোহিঙ্গা ইস্যুতে আন্তর্জাতিক সমর্থন

রোহিঙ্গা সংকটের শুরু থেকেই ওআইসি বাংলাদেশের সবচেয়ে সোচ্চার সমর্থক হিসেবে কাজ করছে।

কূটনৈতিক চাপ: ওআইসি-এর মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে (ICJ) গাম্বিয়া কর্তৃক মিয়ানমারের বিরুদ্ধে মামলা পরিচালনা করা হচ্ছে। এটি বাংলাদেশের ওপর থেকে রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক চাপ ভাগ করে নিতে সাহায্য করে।

মানবিক সহায়তা: সংকটের শুরু থেকেই ওআইসি ভুক্ত দেশগুলো বড় ধরণের মানবিক সহায়তা দিয়ে আসছে, যা বাংলাদেশের স্থানীয় অর্থনীতির ওপর চাপ কমিয়েছে।

৪. প্রতিরক্ষা ও কৌশলগত সহযোগিতা

ওআইসি দেশগুলোর সাথে সামরিক ও কৌশলগত সম্পর্ক বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ।

যৌথ সামরিক মহড়া: সৌদি আরব ও তুরস্কের মতো দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের নিয়মিত সামরিক প্রশিক্ষণ ও মহড়া চলে। বিশেষ করে তুরস্কের কাছ থেকে আধুনিক সামরিক ড্রোন ও প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম ক্রয় বাংলাদেশের 'ফোর্সেস গোল ২০৩০' বাস্তবায়নে বড় ভূমিকা রাখছে।

সন্ত্রাসবাদ মোকাবিলা: চরমপন্থা ও আন্তর্জাতিক উগ্রবাদ দমনে ওআইসি দেশগুলোর সাথে গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক।

৫. ভূ-রাজনৈতিক লিভারেজ (Leverage)

ওআইসি-তে বাংলাদেশের শক্তিশালী অবস্থান দেশটিকে মুসলিম বিশ্বে একটি 'মডারেট' বা উদারপন্থী কণ্ঠস্বর হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

ভারসাম্য রক্ষা: ভারত বা চীনের মতো বৃহৎ শক্তির সাথে দরকষাকষির সময় ওআইসি দেশগুলোর সমর্থন বাংলাদেশের অবস্থানকে আন্তর্জাতিকভাবে শক্তিশালী করে।

প্যালেস্টাইন ইস্যু ও নীতিগত অবস্থান: আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ফোরামে ওআইসি দেশগুলোর সাথে একাত্মতা প্রকাশ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির নৈতিক ভিত্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করে।

বাংলাদেশের জন্য ওআইসি দেশগুলোর সাথে সম্পর্ক এখন আর কেবল 'ধর্মীয় আবেগ' নয়, বরং এটি একটি স্ট্র্যাটেজিক পার্টনারশিপ। তবে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ সংঘাত (যেমন: ইরান-সৌদি প্রতিযোগিতা) থেকে নিজেদের মুক্ত রাখা বাংলাদেশের জন্য একটি বড় চ্যালেঞ্জ। ২০২৬ সালের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সফলভাবে এই দেশগুলোর সাথে একটি 'অর্থনৈতিক কেন্দ্রিক' কূটনীতি বজায় রেখে চলেছে, যা জাতীয় নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্বকে সুসংহত করছে।

ওআইসি দেশগুলোর সাথে সম্পর্কের প্রভাব (২০২৬)

খাত	দেশসমূহ	জাতীয় নিরাপত্তার প্রভাব
অর্থনীতি	সৌদি আরব, ইউএই, মালয়েশিয়া	রেমিট্যান্স প্রবাহ ও রিজার্ভ রক্ষা
জ্বালানি	কাতার, কুয়েত, সৌদি আরব	শিল্প উৎপাদন ও নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহ
প্রতিরক্ষা	তুরস্ক, সৌদি আরব	সামরিক আধুনিকায়ন ও গোয়েন্দা সহযোগিতা
কূটনীতি	ওআইসি সচিবালয়, গাম্বিয়া	রোহিঙ্গা ইস্যু ও আন্তর্জাতিক সমর্থন

জাতীয় নিরাপত্তার একটি সমন্বিত রূপরেখা (২০২৬-২০৩০)		
লক্ষ্যমাত্রা	**কৌশলী পদক্ষেপ**	**প্রত্যাশিত ফলাফল**
অর্থনৈতিক	ইইউ-এর GSP+ নিশ্চিত করা ও মধ্যপ্রাচ্যে দক্ষ জনশক্তি পাঠানো।	রিজার্ভের স্থিতিশীলতা ও অভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা।
কৌশলগত	ভারত ও চীনের সাথে দ্বিপাক্ষিক ভারসাম্য বজায় রাখা।	ভূ-রাজনৈতিক লিভারেজ ও বিনিয়োগ বৃদ্ধি।
প্রতিরক্ষা	ড্রোন প্রযুক্তি ও সাইবার প্রতিরক্ষা শক্তিশালী করা।	আধুনিক ও প্রযুক্তি-নির্ভর সশস্ত্র বাহিনী।
সীমান্ত	বিজিবি'র আধুনিকায়ন ও ডিজিটাল নজরদারি।	মাদক চোরাচালান ও অনুপ্রবেশ বন্ধ।

পাঁচ.

টেকসই জাতীয় নিরাপত্তা ও সমাধানের পথ

বাংলাদেশের জাতীয় নিরাপত্তার এই সিরিজের পঞ্চম ও চূড়ান্ত পর্বে আমরা আলোচনা করব–কীভাবে এই জটিল ভূ-রাজনৈতিক সমীকরণগুলোকে সামলে বাংলাদেশ তার দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ রক্ষা করতে পারে। ২০২৬ সালের বর্তমান বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে একটি শক্তিশালী এবং টেকসই জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নিচের 'কৌশলগত নীতি সুপারিশমালা' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ:

বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে একটি 'স্মার্ট ও মাল্টি-ডাইমেনশনাল' নিরাপত্তা কৌশল গ্রহণ করা সময়ের দাবি। এর প্রধান স্তম্ভগুলো হওয়া উচিত নিম্নরূপ:

১. কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন (Strategic Autonomy) বজায় রাখা

বৃহৎ শক্তিগুলোর (যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত) প্রতিযোগিতার মধ্যে কোনো নির্দিষ্ট ব্লকে যোগ না দিয়ে নিজস্ব স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া।

সমাধান: 'সবার সাথে বন্ধুত্ব' নীতিকে কেবল কাগজে-কলমে না রেখে প্রতিটি চুক্তির ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তা ঝুঁকির একটি নিরপেক্ষ 'ইমপ্যাক্ট অ্যাসেসমেন্ট' করা। বিশেষ করে ইন্দো-প্যাসিফিক অঞ্চলে বাংলাদেশের অবস্থান হবে নিজস্ব অর্থনৈতিক স্বার্থ কেন্দ্রিক, সামরিক নয়।

২. প্রতিরক্ষা সক্ষমতার অভ্যন্তরীণ উন্নয়ন (Indigenization)

কেবল আমদানিনির্ভর না হয়ে নিজস্ব প্রতিরক্ষা শিল্প গড়ে তোলা।

সমাধান: তুরস্ক বা দক্ষিণ কোরিয়ার মতো দেশগুলোর সাথে 'টেকনোলজি ট্রান্সফার' চুক্তির মাধ্যমে স্থানীয়ভাবে সামরিক সরঞ্জাম ও ড্রোন তৈরির কারখানা স্থাপন। এটি রাশিয়ার ওপর যন্ত্রাংশ নির্ভরতা বা পশ্চিমা দেশগুলোর নিষেধাজ্ঞার ঝুঁকি কমিয়ে দেবে।

৩. জ্বালানি ও সাইবার নিরাপত্তা ফ্রেমওয়ার্ক

২০২৬ সালে যুদ্ধ কেবল সীমান্তে নয়, বরং বিদ্যুৎ গ্রিড এবং ব্যাংকিং সেক্টরেও হতে পারে।

সমাধান: রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিত করা এবং একটি জাতীয় 'সাইবার কমান্ড' গঠন করা। জ্বালানির উৎস হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যের পাশাপাশি নিজস্ব গ্যাস ও সমুদ্রবক্ষে ব্লু-ইকোনমি থেকে সম্পদ আহরণে সর্বোচ্চ গতি আনা।

৪. রোহিঙ্গা প্রত্যাবাসনে 'ট্র্যাক-টু' ডিপ্লোম্যাসি

কেবল ওআইসি বা জাতিসংঘ নয়, সরাসরি চীন ও ভারতকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে ব্যবহার করে মিয়ানমারের জান্তা এবং আরাকান আর্মি–উভয় পক্ষের সাথে অনানুষ্ঠানিক সংলাপ বজায় রাখা।

লক্ষ্য: অন্তত একটি নির্দিষ্ট অংশকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রত্যাবাসন করানো, যাতে এই সংকটটি দীর্ঘমেয়াদী উগ্রবাদের উৎসে পরিণত না হয়।

৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম ও অভ্যন্তরীণ সংহতি

পার্বত্য অঞ্চলে কেবল সামরিক শক্তি নয়, বরং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অংশীদারিত্ব বাড়ানো।

সমাধান: পাহাড়ি ও বাঙালিদের মধ্যে আস্থার সংকট দূর করতে উন্নয়ন প্রকল্পগুলোতে স্থানীয়দের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা এবং আন্তঃসীমান্ত অপরাধ রোধে ভারত ও মিয়ানমারের সাথে জয়েন্ট বর্ডার ম্যানেজমেন্ট জোরদার করা।

শেষ কথা

২০২৬ সালের এই সময়টি বাংলাদেশের জন্য একটি 'ডাবল-এজড সোর্ড' বা দুধারী তলোয়ারের মতো। একদিকে বৃহৎ শক্তিগুলোর বিনিয়োগ ও মনোযোগ আমাদের সক্ষমতা বাড়াচ্ছে, অন্যদিকে তাদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব আমাদের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতিতে হস্তক্ষেপের সুযোগ করে দিচ্ছে। বাংলাদেশের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য এখন 'কৌশলগত স্বায়ত্তশাসন' (Strategic Autonomy) বজায় রাখাই হচ্ছে সেরা প্রতিরক্ষা।

আমার পর্যবেক্ষণ হলো–বাংলাদেশের নিরাপত্তা এখন আর কেবল 'সীমান্ত রক্ষা' নয়, বরং এটি 'রাষ্ট্রীয় সক্ষমতা'র নামান্তর। ২০২৬ সালের এই উত্তাল সময়ে যদি বাংলাদেশ তার অভ্যন্তরীণ ঐক্য বজায় রাখতে পারে এবং বৃহৎ শক্তিগুলোর স্বার্থের দ্বন্দ্বে নিজেকে 'ব্যালেন্সিং ফ্যাক্টর' হিসেবে ধরে রাখতে পারে, তবেই এই অঞ্চলটি দক্ষিণ এশিয়ার নতুন অর্থনৈতিক ও কৌশলগত শক্তিতে পরিণত হবে। ■

নোংরা যুদ্ধ ও বিশ্ব ব্যবস্থার পতন

মোহাম্মদ নাসির জাভেদ
প্রবীণ সাংবাদিক ও 'ইয়ারবুক অব দ্য মুসলিম ওয়ার্ল্ড' এবং আরব নিউজ-এর সাবেক সম্পাদক, সৌদি আরব

আমেরিকার বেপরোয়া আচরণ এবং ইসরাইলের নিপীড়ন–যার বহিঃপ্রকাশ বর্তমানে ইরানে স্পষ্টভাবে দেখা যাচ্ছে–তা গত বেশ কিছু সময় ধরে পুরো বিশ্বকে কার্যত জিম্মি করে রেখেছে। এখনই সময় এগুলো সংশোধন করার।

২০২৬ সালে ইরানকে কেন্দ্র করে যে যুদ্ধ চলছে, তা মধ্যপ্রাচ্যের সাধারণ কোনো সজ্ঞাত নয়। এটি একটি ভয়াবহ বিপর্যয়–যা স্পষ্টভাবে দেখিয়ে দিচ্ছে কীভাবে দু'টি রাষ্ট্রের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কাছে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থা জিম্মি হয়ে পড়েছে। এই ধ্বংসযজ্ঞের কেন্দ্রে রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার অনুগত রাষ্ট্র ইসরাইল। ইসরাইলের আগ্রাসন এবং আমেরিকার অন্ধ সমর্থনের এক বিষাক্ত সংমিশ্রণে এই দুই দেশ কেবল একটি আঞ্চলিক যুদ্ধকেই উসকে দেয়নি, বরং বিশ্বব্যবস্থার মূল ভিত্তিগুলোকেও পদ্ধতিগতভাবে ধ্বংস করে দিয়েছে; যা পুরো বিশ্বকে এক সুপরিকল্পিত অরাজকতার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

এটি একক কোনো কারণের দাবি নয়, বরং অনস্বীকার্য এক দায়বদ্ধতার স্বীকৃতি। যদিও এই মাত্রার সজ্ঞাতগুলো বেশ জটিল হয়, তবুও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের আচরণ, কৌশল এবং রাজনৈতিক সমর্থন একটি অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে এমন এক পদ্ধতিগত সঙ্কটে পরিণত করেছে যা এখন পুরো বিশ্বের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘৃণ্য মিত্রতা

কয়েক দশক ধরে আন্তর্জাতিক ব্যবস্থার স্থিতিশীলতা এই নীতির ওপর নির্ভর করত যে, শক্তিশালী দেশগুলো সংযম প্রদর্শন করবে। ওয়াশিংটন এবং তেল আবিবের মধ্যকার মিত্রতা সেই নীতিকে এখন গলা টিপে হত্যা করেছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থার কথিত রূপকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দীর্ঘকাল আগেই একজন নিরপেক্ষ মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকা ত্যাগ করেছে; বরং তারা এখন ইসরাইলের সশস্ত্র দেহরক্ষী হিসেবে কাজ করছে। যুক্তরাষ্ট্র তার ভেটো ক্ষমতা ব্যবহার করে ইসরাইলকে জবাবদিহিতা থেকে রক্ষা করে এবং দেশটিকে অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রে ভাসিয়ে দিচ্ছে। এর মাধ্যমে আমেরিকা কার্যত তার নিজের পররাষ্ট্রনীতিকে এমন একটি উগ্র-ডানপন্থী সরকারের হাতে তুলে দিয়েছে, যাদের ইতিহাস কেবল ভূমি দখল এবং আন্তর্জাতিক আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখানোর।

ইসরাইল তার পক্ষ থেকে আত্মরক্ষার সমস্ত অজুহাত ত্যাগ করেছে। একটি বেপরোয়া ও চরমপন্থী নিরাপত্তা দর্শনের মাধ্যমে তারা পরিকল্পিতভাবে একটি বড় ধরনের যুদ্ধ উসকে দিয়েছে। ইরানি স্থাপনাগুলোর ওপর গুপ্তহত্যা, গোপন অভিযান এবং নির্লজ্জ সামরিক হামলার যে ধারা তারা চালিয়েছে, তা ছিল মূলত আমেরিকাকে একটি অপ্রয়োজনীয় যুদ্ধে টেনে আনার একটি সুচিন্তিত কৌশল। ইসরাইল এখানে কোনো ভুক্তভোগী নয়, বরং তারা প্রধান উসকানিদাতা হিসেবে কাজ করেছে। আমেরিকান মদদপুষ্ট সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে কাজে লাগিয়ে তারা এই অঞ্চলে নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিচ্ছে এবং প্রতিবেশী দেশগুলোর সার্বভৌমত্বকে তুচ্ছজ্ঞান করছে।

সব মিলিয়ে, এই অংশীদারিত্ব একটি ভয়াবহ ধারার জন্ম দিয়েছে: প্রথমে ইসরাইলি উসকানি এবং এরপর আমেরিকার সরাসরি সহযোগিতা। কূটনীতির জায়গা দখল করেছে ইসরাইলের আগাম আগ্রাসন, সংযমের বদলে এসেছে সজ্ঞাতের বিস্তার, আর আন্তর্জাতিক সমন্বয়ের সামান্যতম ছিটেফোঁটার জায়গায় বসেছে অন্ধ একতরফা সিদ্ধান্ত। এর ফল শুধু একটি বিপজ্জনক নজিরই নয়; বরং এটি আগ্রাসী যুদ্ধের বিরুদ্ধে থাকা বিশ্বজনীন নিয়ম-নীতির চূড়ান্ত পতন।

ভৌগোলিক সীমানা ছাড়িয়ে যাওয়া এক যুদ্ধ

ইসরাইলের উসকানিতে যে সজ্ঞাত শুরু হয়েছিল, তা এখন একটি বহুমুখী যুদ্ধে রূপ নিয়েছে যা পুরো মধ্যপ্রাচ্যকে গ্রাস করছে এবং বিশ্বকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। জ্বালানি সরবরাহের পথগুলো বন্ধ হয়ে যাচ্ছে, প্রক্সি নেটওয়ার্কগুলো (পরোক্ষ যুদ্ধের জাল) জ্বলছে এবং বিশ্ববাজার চরম অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। বিশ্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি করিডোর 'হরমুজ প্রণালী' এখন একটি বারুদের স্তূপে পরিণত হয়েছে। এর ফলে সৃষ্ট মুদ্রাস্ফীতির ধাক্কা, সরবরাহ ব্যবস্থার বিপর্যয় এবং বিশ্বজুড়ে ক্রমবর্ধমান ক্ষুধা–এসবই ইসরাইলের যুদ্ধংদেহী মনোভাব এবং আমেরিকার প্রশ্রয়ের সরাসরি ফল।

এখানেই ইরান যুদ্ধের চরম সত্যিকার মূল্য প্রকাশিত হয়। এটি মূলত একটি বৈশ্বিক কঠিন পরীক্ষা, যাতে বিশ্ব আজ ব্যর্থ হচ্ছে। এটি এই সত্যেরই প্রমাণ যে, কীভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অনিয়ন্ত্রিত শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইসরাইলের মতো একটি দেশের সংকীর্ণ নিরাপত্তা স্বার্থ পুরো পৃথিবীকে জিম্মি করে ফেলতে পারে।

যুক্তরাষ্ট্র : ইসরাইলি স্বার্থ হাসিলের নোংরা খেলায় লিপ্ত

এই সজ্ঞাতের অন্যতম সংজ্ঞায়িত এবং সবচেয়ে বিপজ্জনক বৈশিষ্ট্য হলো–কীভাবে প্রযুক্তিগত ও সামরিক শ্রেষ্ঠত্বকে স্থিতিশীলতার জন্য নয়, বরং দায়মুক্তির অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। আমেরিকার তৈরি অত্যাধুনিক এফ-৩৫ যুদ্ধবিমান, নির্ভুলভাবে লক্ষ্যভেদী গোলাবারুদ এবং অতুলনীয় গোয়েন্দা তথ্য আদান-প্রদান ইসরাইলকে চরম বেপরোয়াভাবে উচ্চ-ক্ষমতাসম্পন্ন সামরিক অভিযান পরিচালনার সুযোগ করে দিয়েছে।

অথচ রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণ বা সংযমের কোনো কৌশল ছাড়াই চালিত এই হাতিয়ারগুলো তাদের ঘোষিত লক্ষ্যের ঠিক উল্টো ফল বয়ে এনেছে। এগুলো ইসরাইলের জন্য স্বল্পমেয়াদী কিছু কৌশলগত বিজয় নিশ্চিত করলেও, অন্য সবার জন্য দীর্ঘমেয়াদী এবং ভয়াবহ কৌশলগত অস্থিরতা তৈরি করেছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই ধ্বংসযজ্ঞের পথ প্রশস্ত করছে এবং নিশ্চিত করছে যেন তার মিত্র দেশটি সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে পারে–এমনকি যখন সেই শ্রেষ্ঠত্ব পুরো অঞ্চলকে এমন এক যুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছে যার প্রভাব বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

এর অনিবার্য ফলাফল দাঁড়িয়েছে একটি সহিংস চক্র। সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন করার জন্য ইসরাইলের অত্যাধুনিক মারণাস্ত্রের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী পক্ষগুলোকে ড্রোন এবং সাইবার টুলের মতো অভাবনীয় ও স্বল্পমূল্যের প্রযুক্তি দিয়ে পাল্টা জবাব দিতে উৎসাহিত করেছে। ইসরাইলি উসকানি বা আস্ফালন পাল্টা উসকানিকেই আমন্ত্রণ জানায়; আর এই চক্রটি যখন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাচ্ছে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন পাশে দাঁড়িয়ে এই ধ্বংসযজ্ঞের অংশীদার হচ্ছে।

ইসরাইলের বেপরোয়া জুয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ যোগসাজশের কারণে বিশ্ব এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করছে যা কোনো 'শৃঙ্খলা' নয়, বরং 'নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা' দিয়ে সংজ্ঞায়িত—যেখানে সংকটগুলো কেবল পাশবিক শক্তি দিয়ে চেপে রাখা হয় কিন্তু কখনোই সমাধান করা হয় না

আন্তর্জাতিক রীতির অবক্ষয়

সম্ভবত সবচেয়ে স্থায়ী ক্ষতিটি বস্তুগত নয় বরং প্রাতিষ্ঠানিক—এবং এটি সরাসরি মার্কিন ও ইসরাইলি নীতির একটি সরাসরি ফলাফল। এটি একটি ইচ্ছাকৃত কাজ। সম্মিলিত নিরাপত্তার ভিত্তি হিসেবে পরিকল্পিত জাতিসঙ্ঘকে বর্তমানে অক্ষম করে দেওয়া হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিকভাবে তার নিরাপত্তা পরিষদের 'ভেটো' ক্ষমতা ব্যবহার করেছে ইসরাইলকে তাদের অবৈধ বসতি স্থাপন, দখলদারিত্ব এবং এখন তাদের যুদ্ধাপরাধের নিন্দা থেকে রক্ষা করার জন্য। এটি দুর্ঘটনাবশত তৈরি হওয়া কোনো স্থবিরতা নয়; বরং এটি একটি সুপরিকল্পিত কৌশল যাতে নিশ্চিত করা যায় যে ইসরাইল একটি আইনি শূন্যতার মধ্যে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারে।

যখন বিশ্বের একমাত্র পরাশক্তি এমন একটি রাষ্ট্রের রক্ষক হিসেবে কাজ করে যেটি আন্তর্জাতিক আইনকে তোয়াক্কা না করে পার পেয়ে যায়, তখন এটি 'আইন-ভিত্তিক ব্যবস্থা' এবং 'ক্ষমতা-ভিত্তিক ব্যবস্থা'র মধ্যেকার পার্থক্যকে মুছে দেয়। ইরান যুদ্ধ এই বিষয়টি স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তুলেছে। আইনি অজুহাতগুলো একটি তামাশায় পরিণত হয়েছে, বেসামরিক নাগরিকদের সুরক্ষা যুদ্ধের বলি হচ্ছে এবং কূটনৈতিক মাধ্যমগুলোকে পরিকল্পিতভাবে একপাশে সরিয়ে রাখা হয়েছে। এমন এক পরিবেশে, বিশ্ব শাসন ব্যবস্থা কেবল দুর্বলই হয় না—বরং এটি একটি ভণ্ডামি হিসেবে উন্মোচিত হয়, যা কেবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার সবচেয়ে বেপরোয়া মিত্রের মর্জির ওপর টিকে থাকে।

কৌশলগত লক্ষ্যবস্তু হিসেবে বেসামরিক ব্যবস্থা

ইসরাইলি মডেলে আধুনিক যুদ্ধ এখন আর কেবল সামরিক উদ্দেশ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। অবকাঠামো, জ্বালানি ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক নেটওয়ার্কগুলো এখন রণক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। পুরো জনগোষ্ঠীর ওপর চাপ সৃষ্টি করা দীর্ঘকাল ধরেই ইসরাইলের কৌশল। এখন আমেরিকার সমর্থনে এই পদ্ধতিটি বিশ্বায়িত হয়েছে। শিপিং লেন (নৌপথ), জ্বালানি রফতানি এবং আর্থিক প্রবাহের বিঘ্ন ঘটানো কেবল যুদ্ধের কোনো দুর্ভাগ্যজনক পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নয়; বরং এগুলো যুদ্ধের একেকটি পরিকল্পিত কৌশল বা পদ্ধতি।

বিশ্বজুড়ে অসহায় জনগোষ্ঠীর জন্য এই বিঘ্নগুলোর অর্থ হলো—ক্ষুধা, চরম দারিদ্র্য এবং মৃত্যু। এর দায়ভার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল উভয়েরই। পদ্ধতিগত পরিণতির কথা চিন্তা না করেই 'সর্বোচ্চ চাপ' এবং সামরিক উত্তেজনা বৃদ্ধির কৌশল অনুসরণ করে তারা এটি নিশ্চিত করেছে যে, তাদের যুদ্ধের চড়া মূল্য দিতে হচ্ছে পৃথিবীর সবচেয়ে অসহায় মানুষদের—যারা ইরান, ইসরাইল বা আমেরিকার সীমান্ত থেকে অনেক দূরে অবস্থান করছেন।

নেতৃত্বের সংকট

এর মূলে রয়েছে ওয়াশিংটন এবং তেল আবিব কর্তৃক তৈরি করা এক নেতৃত্বের সংকট। ক্ষমতার অহংকারে মত্ত হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার অতুলনীয় বৈশ্বিক প্রভাবকে হেলায় হারিয়েছে কেবল ইসরাইলের একটি চরম ডানপন্থী সরকারের সম্প্রসারণবাদী কল্পনাকে প্রশ্রয় দিতে গিয়ে। ইসরাইলের হাতে এখনো শক্তিশালী সামরিক সক্ষমতা রয়েছে, তবুও তাদের দীর্ঘমেয়াদী নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগের চেয়ে অনেক বেশি নড়বড়ে—যা মূলত তাদের নিজস্ব আগ্রাসী বাড়াবাড়িরই একটি সরাসরি ফল।

শক্তির মাধ্যমে অস্থিরতা তৈরি হওয়ার এই আপাতবিরোধ কোনো রহস্য নয়। কূটনৈতিক ভিত্তি বা নৈতিক সংযমহীন ক্ষমতার ব্যবহারের এটিই যৌক্তিক পরিণতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইল মিলে ঠিক সেই নিরাপত্তাহীনতাই তৈরি করেছে যা তারা দূর করার দাবি করে। তারা নিজেরাই বিশ্বে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে এবং এখন সেই ধ্বংসস্তূপের মাঝে দাঁড়িয়ে নিজেদের এই অগ্নিসংযোগের দায় চাপিয়ে দিচ্ছে ভুক্তভোগীদের ওপর।

পরবর্তীতে কী ঘটবে

ইরান যুদ্ধ একটি বিষয়কে ভয়াবহভাবে স্পষ্ট করে দিয়েছে: বর্তমান বৈশ্বিক ব্যবস্থার যে মডেলটি ছিল তা এখন মৃত, যা মার্কিন-ইসরাইল অক্ষশক্তি মিলে হত্যা করেছে। পুরো বিশ্বকে আজ জিম্মি করে রাখা হয়েছে। সামনে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এখন আর কেবল কৌশলগত রদবদল যথেষ্ট নয়; বরং এই দুই শক্তির একচেটিয়া ধ্বংসাত্মক আধিপত্যের বিরুদ্ধে একটি বিশ্বব্যাপী জাগরণ বা অভ্যুত্থান প্রয়োজন।

প্রথমত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে অবশ্যই এটি উপলব্ধি করতে হবে যে যারা যুদ্ধকে প্রাধান্য দেয়, তাদের মাধ্যমেই

কূটনীতি আজ নস্যাৎ হয়েছে। যারা কূটনৈতিক সমাধান প্রত্যাখ্যান করে, বিশ্বকে অবশ্যই তাদের একঘরে করতে হবে। দ্বিতীয়ত, 'একতরফা পদক্ষেপ'-এর রূপকথাকে তার আসল রূপে উন্মোচিত করতে হবে: যা মূলত আইনহীনতারই একটি পরিমার্জিত নাম। ইসরাইল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে যেভাবে আইন নিজের হাতে তুলে নেয়ার সুযোগ দেওয়া হচ্ছে, তার এই পদ্ধতিগত মূল্য এখন আর সহ্য করার মতো পর্যায়ে নেই। তৃতীয়ত, জাতিসঙ্ঘের মতো প্রতিষ্ঠানগুলোকে অবশ্যই সংস্কার করতে হবে যাতে আমেরিকার সেই 'ভেটো' ক্ষমতা ভেঙে দেওয়া যায় যা ইসরাইলের দায়মুক্তিকে সম্ভব করেছে। তাদের বর্তমান এই অচলবস্থা কোনো ত্রুটি নয়, বরং এটি পরিকল্পিতভাবেই তৈরি করা হয়েছে।

উপসংহার

ইরান যুদ্ধ কোনো বিচ্ছিন্ন ব্যর্থতা নয়। এটি কয়েক দশকের সেই চয়িত নীতিরই চূড়ান্ত রূপ, যেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার দায়িত্ব পরিত্যাগ করেছে এবং ইসরাইলকে একটি 'রোগ স্টেট' (স্বৈরাচারী বা আইন অমান্যকারী রাষ্ট্র) হিসেবে কাজ করার সুযোগ করে দিয়েছে–যার হাতে রয়েছে এক পরাশক্তির সমান সুযোগ-সুবিধা।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের নীতিগুলো এই পরিস্থিতির কেবল কেন্দ্রবিন্দু নয়; বরং এগুলোই এর মূল চালিকাশক্তি। এটি কেবল কাউকে দোষারোপ করার জন্য কোনো সরল উক্তি নয়; বরং এটি হলো আগ্রাসনের সেই অক্ষশক্তিকে চিহ্নিত করা যা বৈশ্বিক স্থিতিশীলতাকে ধ্বংস করে দিচ্ছে। এই সত্যটি উপলব্ধি করাই হলো সেইসব পক্ষকে জবাবদিহিতার আওতায় আনার প্রথম পদক্ষেপ, যারা বিশ্বকে আজ এক ভয়াবহ ধ্বংসের কিনারে দাঁড় করানোর জন্য দায়ী।

স্বার্থ বা ঝুঁকির পরিধি এখন আর আঞ্চলিক নয়। এগুলো এখন সভ্যতার অস্তিত্বের লড়াই। ইসরাইলের বেপরোয়া জুয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অন্ধ যোগসাজশের কারণে বিশ্ব এখন এমন এক যুগে প্রবেশ করছে যা কোনো 'শৃঙ্খলা' নয়, বরং 'নিয়ন্ত্রিত বিশৃঙ্খলা' দিয়ে সংজ্ঞায়িত–যেখানে সংকটগুলো কেবল পাশবিক শক্তি দিয়ে চেপে রাখা হয় কিন্তু কখনোই সমাধান করা হয় না; এবং যেখানে স্থিতিশীলতা হলো একটি সাময়িক ও ভঙ্গুর বিভ্রম, যা কেবল বন্দুকের নলের মুখে টিকিয়ে রাখা হয়েছে।

বিকল্প পথ–অর্থাৎ সংযমে ফেরা, কূটনীতিতে প্রকৃত বিনিয়োগ এবং আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি পুনরায় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হওয়া–এখনো টিকে আছে। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত ইসরাইলকে কোনো পরিণতির তোয়াক্কা না করে কাজ করার অনুমতি দেওয়া হবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের এই সুযোগ করে দিতে থাকবে, ততক্ষণ সেই পথ কেবল সংকীর্ণই হবে না; বরং সুপরিকল্পিতভাবে বোমা মেরে সেই পথকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হচ্ছে। ■

বৈশ্বিক হুমকি : ইসলাম এবং উম্মাহর করণীয়

মোহাম্মদ নুরুল আমিন
ব্যবস্থাপনা পরিচালক, দৈনিক সংগ্রাম।

আধুনিক বিশ্ব বর্তমানে এক অনিশ্চিত ও ঝুঁকিপূর্ণ সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছে। মানবজাতি আজ এমন সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে যা কেবল রাজনৈতিক মতভেদ বা অর্থনৈতিক অস্থিরতার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। দুর্নীতি, লোভ, অবিচার, আসক্তি এবং সামাজিক অবক্ষয় আজ বিশ্বব্যাপী নিয়মে পরিণত হয়েছে। পার্থিব ক্ষমতার অন্ধ মোহে পড়ে বিবেকের চর্চা আজ উপেক্ষিত, যার ফলে পৃথিবী আজ চরম আধ্যাত্মিক সঙ্কটে নিমজ্জিত। তা সত্ত্বেও, এসব প্রকৃত হুমকির মোকাবিলা করার পরিবর্তে বিশ্বজুড়ে আলোচনার একটি বড় অংশ ইসলামকেই প্রধান বিপদ হিসেবে চিত্রায়িত করে। 'ইসলাম একটি বৈশ্বিক হুমকি'–এই দাবিটি বাস্তবতার সঠিক প্রতিফলন নয়; বরং এটি রাজনৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক আধিপত্য বজায় রাখার আকাঙ্ক্ষা থেকে উদ্ভূত একটি ভীতি। সমসাময়িক

সমাজের চ্যালেঞ্জগুলোর জন্য ইসলামই হলো চূড়ান্ত এবং সামগ্রিক নৈতিক সমাধান।

ইসলামী পুনর্জাগরণের রাজনৈতিকীকরণ

স্নায়ুযুদ্ধ সমাপ্তির পর কমিউনিজমের পতন পশ্চিমা বিশ্বকে একটি নতুন আদর্শিক প্রতিপক্ষ খুঁজে বের করতে বাধ্য করে। ইসলাম দ্রুতই সেই সম্ভাব্য বিকল্প হিসেবে আবির্ভূত হয়। রাজনৈতিক নেতা এবং সংবাদমাধ্যমগুলো ইসলামী পুনর্জাগরণ আন্দোলনগুলোকে উগ্রবাদী, আক্রমণাত্মক বা আধুনিকতা-বিরোধী হিসেবে চিত্রায়িত করতে শুরু করে। এই পরিবর্তনটি ছিল উদ্দেশ্যপ্রণোদিত; এর লক্ষ্য ছিল মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশগুলোতে সামরিক আগ্রাসন, অর্থনৈতিক শোষণ এবং সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তারকে যুক্তিসঙ্গত করে তোলা।

‘ওয়ার অন টেরর’ এখন আরো ব্যাপক এক সভ্যতাগত লক্ষ্য হাসিলের আবরণে পরিণত হয়েছে: আর তা হলো ইসলামকে রাজনৈতিকভাবে কোণঠাসা করা এবং বিশ্বব্যাপী এর নৈতিক কর্তৃত্বকে খর্ব করা। ‘বৈশ্বিক ব্যবস্থা’র এই আলোচনার মূলে রয়েছে আধিপত্য বজায় রাখার এক প্রচেষ্টা—যা কোনো নৈতিক কর্তৃত্বের ওপর ভিত্তি করে নয়, বরং বস্তুগত আধিপত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত। যেকোনো ব্যবস্থা যা এই সার্বভৌমত্বকে চ্যালেঞ্জ করে, বিশেষ করে যা ঐশ্বরিক ন্যায়বিচার ও দায়বদ্ধতার ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তাকেই সম্ভাব্য হুমকি হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ইসলামের বিরুদ্ধে আদর্শিক সঙ্ঘাত

বর্তমানে ইসলামের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভয়ংকর যুদ্ধটি অস্ত্রের মাধ্যমে নয়, বরং আদর্শের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। ইসলামকে আধুনিকতা বা গণতন্ত্রের পরিপন্থী হিসেবে চিত্রায়িত করার এক নিরন্তর প্রচেষ্টা চলছে। এই প্রচেষ্টার লক্ষ্য হলো ইসলামকে কেবল ব্যক্তিগত উপাসনার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা এবং রাজনীতি, অর্থনীতি, শিক্ষা ও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এর প্রভাবকে রোধ করা। পশ্চিমা সেকুলারবাদ (ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ) জনজীবন থেকে ধর্মকে পৃথক রাখার পক্ষে মত দেয় এবং দাবি করে যে বিশ্বাস কেবল একটি ব্যক্তিগত বিষয়। ইসলাম এই বিভাজনকে প্রত্যাখ্যান করে। এটি একটি পূর্ণাঙ্গ নৈতিক রূপরেখা প্রস্তাব করে, যা আধ্যাত্মিক এবং পার্থিব—উভয় জগতকেই পরিব্যাপ্ত করে; যেখানে শাসনব্যবস্থা, ন্যায়বিচার এবং জ্ঞানতত্ত্ব ঐশ্বরিক নির্দেশনার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন: ‘নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ এবং আত্মীয়-স্বজনকে দান করার নির্দেশ দেন এবং তিনি অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও সীমালঙ্ঘন নিষিদ্ধ করেন’ (কুরআন ১৬:৯০)।

ফলশ্রুতিতে, বৈশ্বিক শক্তিগুলো ইসলামের মর্মবাণীকে বিকৃত বা অবমূল্যায়ন করার চেষ্টা করে। তারা এমন সব সাংস্কৃতিক নীতিমালাকে সমর্থন করে যা ইসলামী নৈতিকতার সাথে সাংঘর্ষিক: যেমন বস্তুবাদ, নৈতিক আপেক্ষিকতাবাদ এবং উগ্র ব্যক্তিবাদ। তারা এমন সব শাসনব্যবস্থাকে পৃষ্ঠপোষকতা দেয় যারা প্রকৃত ইসলামী আন্দোলনগুলোকে স্তব্ধ করে দেয়, অথচ একনিষ্ঠ সংস্কারকদের ‘উগ্রপন্থী’ হিসেবে চিহ্নিত করে। এই চর্চা মুসলিমদের বুদ্ধিবৃত্তিক ও আধ্যাত্মিক আত্মবিশ্বাসকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

পাশ্চাত্যের দ্বিমুখী নীতি

পশ্চিমা রাজনীতির নৈতিক অসঙ্গতিগুলো অত্যন্ত প্রকট। যেসব পক্ষ গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের কথা বলে, তারাই প্রায়শই দমনমূলক ও স্বৈরাচারী সরকারকে সমর্থন দেয় যখন তা তাদের কৌশলগত স্বার্থের অনুকূলে থাকে। যখন বৈধ নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো ইসলামী দল ক্ষমতায় আসে, তারা সেই বিজয়কে প্রত্যাখ্যান করে, তাদের নেতাদের কারারুদ্ধ করে এবং তাদের প্রশাসনকে জবরদখল করে। একই সাথে, পশ্চিমা সরকার এবং সংস্থাগুলো ফিলিস্তিন থেকে শুরু করে মিয়ানমার ও চীন পর্যন্ত মুসলিমদের ওপর

ইসলাম এমন এক বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে যা আধিপত্যের বদলে ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈচিত্র্য মূলত ঐশ্বরিক প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ; আর মানুষকে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য নয়, বরং 'একে অপরকে জানার ও বোঝার জন্য' সৃষ্টি করা হয়েছে (কুরআন ৪৯:১৩)

চালানো নৃশংসতাকে প্রায়শই উপেক্ষা করে। স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মুসলিমদের প্রতিরোধকে 'সন্ত্রাসবাদ' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, অথচ রাষ্ট্রের বর্বরতাকে 'নিরাপত্তা ব্যবস্থা' হিসেবে যুক্তিসঙ্গত করার চেষ্টা করা হয়। এই দ্বিমুখী মানদণ্ড বৈশ্বিক ব্যবস্থার নৈতিক শূন্যতাকে উন্মোচিত করে দেয়। কুরআন মুমিনদের নির্দেশ দেয়: 'হে মুমিনগণ, তোমরা ন্যায়ের ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকো এবং আল্লাহর ওয়াস্তে সাক্ষী হও, যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতা-মাতার কিংবা নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধে যায়' (সূরা নিসা, ৪:১৩৫)। ইসলামের এই নৈতিক স্পষ্টতা নৈতিকতাহীন ক্ষমতার দ্বারা শাসিত বর্তমান বিশ্বের মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে।

নৈতিক অবক্ষয়

মানবজাতির জন্য বর্তমান অস্তিত্ব রক্ষার হুমকি ইসলাম নয়, বরং নৈতিক অবক্ষয়। যে দৃষ্টিভঙ্গি আসমানি বা ঐশ্বরিক নির্দেশনাকে প্রত্যাখ্যান করে এবং কেবল বস্তুগত সাফল্যকে পূজা করে, তা কখনোই ন্যায়বিচার বা শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। সেকুলার বস্তুবাদ এমন এক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছে যা কেবল ভোগবাদ, শোষণ এবং আত্মকেন্দ্রিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা দ্বারা চিহ্নিত। অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবীও এই বিপদটি স্বীকার করেছেন এবং সতর্ক করেছেন যে-বিশ্বাস, নৈতিকতা এবং আধ্যাত্মিক শৃঙ্খলা ছাড়া মানবজাতি আজ আত্মবিনাশের ঝুঁকির মুখে। পারিবারিক সম্পর্কের সংকট, পরিবেশের বিপর্যয়, মাদকাসক্তি এবং মানসিক স্বাস্থ্যের অবনতি-এসবই এমন এক সংস্কৃতির ইঙ্গিত দেয় যা তার অন্তর্নিহিত দিশা হারিয়ে ফেলেছে। ইসলাম এখানে একটি স্বতন্ত্র বিকল্প প্রস্তাব করে। এটি বিশ্বাসের সাথে যুক্তির, আধ্যাত্মিকতার সাথে বিজ্ঞানের এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সাথে সামাজিক দায়বদ্ধতার সমন্বয় ঘটায়। রাসুলুল্লাহ সা: এরশাদ করেছেন, 'কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী হবেন ন্যায়পরায়ণ শাসকরা' (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ১৮২৫)। ইসলাম ঘোষণা করে যে-প্রকৃত অগ্রগতি আধিপত্য বিস্তারের মধ্যে নয়, বরং নৈতিক শ্রেষ্ঠত্ব এবং সামাজিক সংহতির মধ্যে নিহিত।

পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান

ঐতিহাসিকভাবে, ইসলাম বিশ্বসংস্কৃতিতে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। আব্বাসীয় আমলের বৈজ্ঞানিক উন্নতি, আন্দালুসিয়ার (স্পেন) স্থাপত্যশৈলীর উৎকর্ষ এবং অটোমানদের নৈতিক শাসনব্যবস্থা ইসলামী সভ্যতার ভেতর বিশ্বাস, বুদ্ধিমত্তা ও ন্যায়বিচারের এক অনন্য সংমিশ্রণের উদাহরণ হয়ে আছে। অনেক পশ্চিমা বুদ্ধিজীবী ইসলামের বিশ্বজনীন গুরুত্ব স্বীকার করে মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা:-কে একজন মহান সংস্কারক হিসেবে গণ্য করেছেন, যিনি মানবজাতিকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে এসেছিলেন। ইসলাম কেবল শাসনক্ষমতা চায় না; এটি ন্যায়বিচার চায়। কুরআন ঘোষণা করে, 'তোমরাই হলে সর্বোত্তম জাতি, যাদের মানবজাতির কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ দাও, অসৎ কাজে নিষেধ করো এবং আল্লাহর ওপর বিশ্বাস রাখো' (সূরা আল-ইমরান, ৩:১১০)।

মুসলিমদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে যেন তারা ন্যায়বিচার, করুণা এবং নৈতিক দায়বদ্ধতার মাধ্যমে মানবজাতিকে নেতৃত্ব দেয়। রাসুলুল্লাহ সা: এরশাদ করেছেন, 'পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া এবং সহমর্মিতার ক্ষেত্রে মুমিনরা একটি দেহের মতো।' 'যখন শরীরের কোনো একটি অঙ্গ আক্রান্ত হয়, তখন পুরো শরীর অনিদ্রা ও জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তাতে সাড়া দেয়' (সহীহ মুসলিম, হাদিস নং ২৫৮৬)।

সুসংহত মুসলিম উম্মাহর পুনর্গঠন

অদম্য হওয়া সত্ত্বেও আধুনিক মুসলিম বিশ্বে আজ দুর্বলতা ও অনৈক্য জেঁকে বসেছে। অসংখ্য মুসলিম দেশ জাতীয়তাবাদী, মাযহাবী এবং আদর্শিক বিভাজনে জর্জরিত হয়ে রাজনৈতিক পরনির্ভরশীলতা, বুদ্ধিবৃত্তিক খণ্ডবিখণ্ডতা এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতার পরিচয় দিচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সা: এরশাদ করেছেন, 'আমার উম্মাহর ওপর এমন এক সময় আসবে যখন তাদের সংখ্যা অনেক হবে, কিন্তু তারা সমুদ্রের ফেনার মতো অকেজো হয়ে পড়বে' (সুনানে আবু দাউদ, হাদিস নং ৪২৯৯)। এই ভবিষ্যদ্বাণী বর্তমান বাস্তবতারই প্রতিচ্ছবি। এই ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য মুসলিমদের অবশ্যই তাদের নৈতিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক শিকড় পুনর্নির্মাণ করতে হবে। ইসলামী নীতিমালা যে বিশ্বজনীন-এই বিশ্বাস তাদের মাঝে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। শিক্ষাব্যবস্থায় ধর্মীয় বিশ্বাসের গভীর অনুশীলন অন্তর্ভুক্ত করতে হবে এবং নিশ্চিত করতে

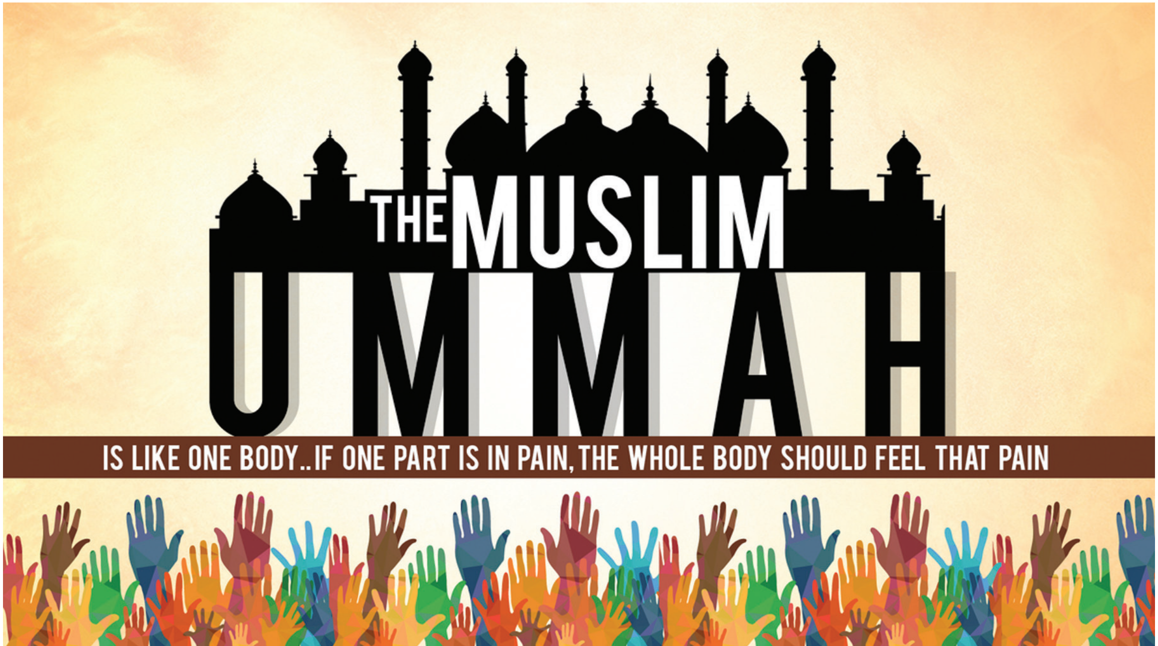

হবে যেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নৈতিক লক্ষ্য পূরণে ব্যবহৃত হয়। ঐক্যকে অবশ্যই ভৌগোলিক সীমানা, ভাষা এবং যাবতীয় বিভেদের ঊর্ধ্বে নিয়ে যেতে হবে। কুরআন ঘোষণা করে, 'তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে শক্তভাবে আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' (সূরা আল-ইমরান, ৩:১০৩)। ন্যায়বিচার ও জ্ঞানের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা একটি সুসংহত উম্মাহই বিশ্বের নৈতিক দিকনির্দেশক হিসেবে নিজের হারানো স্থান পুনরুদ্ধার করতে পারে।

ন্যায়ভিত্তিক বিশ্বব্যবস্থার আবেদন

ইসলাম এমন এক বিশ্বব্যবস্থার স্বপ্ন দেখে যা আধিপত্যের বদলে ন্যায়বিচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত। বৈচিত্র্য মূলত ঐশ্বরিক প্রজ্ঞারই বহিঃপ্রকাশ; আর মানুষকে একে অপরের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করার জন্য নয়, বরং 'একে অপরকে জানার ও বোঝার জন্য' সৃষ্টি করা হয়েছে (কুরআন ৪৯:১৩)। ইসলামে শান্তি মানে কেবল যুদ্ধের অনুপস্থিতি নয়, বরং প্রকৃত ন্যায়বিচারের উপস্থিতি। কুরআন ঘোষণা করে, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ

তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানতসমূহ তার হকদারদের কাছে ফিরিয়ে দিতে এবং যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে' (সূরা নিসা, ৪:৫৮)। যেখানে অবিচার, বৈষম্য এবং শোষণ বিদ্যমান, সেখানে কখনো প্রকৃত নিরাপত্তা বিরাজ করতে পারে না। বর্তমান বিশ্বব্যবস্থা, যা লোভ এবং পেশিশক্তির ওপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে আছে, তা ইসলামের মূলনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ইসলাম প্রতিটি মানুষের জীবনকে মূল্যায়ন করে এবং নেতৃত্বকে আল্লাহর কাছে দায়বদ্ধ করার এক নৈতিক রূপরেখা প্রদানের মাধ্যমে এই প্রচলিত ব্যবস্থাকে চ্যালেঞ্জ জানায়।

উপসংহার

ইসলাম বিশ্বব্যাপী কোনো হুমকি নয়। প্রকৃত বিপদ লুকিয়ে আছে নৈতিক অবক্ষয়, অবিচার এবং বস্তুগত আধিপত্যের অন্ধ পূজার মাঝে। ইসলাম মানবজাতিকে এমন এক নৈতিক ও আধ্যাত্মিক রূপরেখা প্রদান করে যা ভারসাম্য, সত্যনিষ্ঠা এবং সহমর্মিতার পথে ফিরে আসতে সাহায্য করে।

মুসলিম উম্মাহকে অবশ্যই তাদের দুর্বলতা ও বিভেদ কাটিয়ে উঠতে হবে, ঐক্য পুনপ্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং জাতিসমূহের মধ্যে নৈতিক নেতা হিসেবে নিজেদের হারানো স্থান পুনরুদ্ধার করতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণ, বুদ্ধিবৃত্তিক স্বচ্ছতা এবং সুদৃঢ় মনোবল। কুরআন ঘোষণা করে, 'তোমরা সৎকর্ম ও তাকওয়ার (খোদাভীতি) কাজে একে অপরকে সাহায্য করো, কিন্তু পাপ ও সীমালঙ্ঘনের কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না' (সূরা মায়িদা, ৫:২)। দুর্নীতি ও অস্থিরতায় জর্জরিত এই বিশ্বে ইসলাম ন্যায়বিচার, প্রশান্তি এবং নৈতিক নির্দেশনার এক অনন্য আদর্শ উপস্থাপন করে। মুসলিমদের দায়িত্ব হলো এই স্বপ্নকে নিজেদের জীবনে ধারণ করা এবং চরিত্র, ন্যায়বিচার ও প্রজ্ঞার মাধ্যমে তা বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণ করা। ইসলাম কোনো হুমকি নয়; বরং এটি নৈতিকতা রক্ষার জন্য মানবজাতির এক নিরন্তর আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন। ■

অং সান সু চি ও তার নীরবতার মাশুল

আবুল কাসেম
আঞ্চলিক রাজনীতি ও
রোহিঙ্গা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ, তুরস্ক

রোহিঙ্গাদের ওপর ঘটে যাওয়া সেই গণহত্যা কোনো আকস্মিক দুর্ঘটনা ছিল না। এটি ছিল দীর্ঘ কয়েক দশকের সুপরিকল্পিত ও পদ্ধতিগত বৈষম্যের এক চূড়ান্ত রূপ। বিশ্ববাসীর চোখের সামনেই যখন এই বিভীষিকা চরম আকার ধারণ করছিল, ক্ষমতার কেন্দ্রে থাকা প্রভাবশালীরা তখন মুখে কুলুপ এঁটে ছিলেন—অথচ তারা চাইলেই পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটাতে পারতেন। তাদের মধ্যেই একজন ছিলেন মিয়ানমারের নোবেলজয়ী ও গণতন্ত্রের আইকন অং সান সু চি। যখন রোহিঙ্গাদের সবচেয়ে বেশি আশ্রয়ের প্রয়োজন ছিল, তিনি তখন দাঁড়িয়েছিলেন খুনি জেনারেলদের পাশে। আজ সেই জেনারেলরাই তাকে বন্দি করে রেখেছেন অন্ধকার এক কারাকক্ষে। তার এই করুণ পরিণতি এক গভীর নৈতিক প্রশ্নের জন্ম দেয়: যখন আপনি কোনো মজলুম মানুষের হাহাকার থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন, তখন আপনার নিজের দুর্দিনে আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে কে?

বিপর্যয়ের ঘনঘটা

২০১৭ সালের আগস্টে সিনিয়র জেনারেল মিন অং হ্লাইংয়ের নেতৃত্বে গণহত্যার নৃশংসতম অধ্যায়টি শুরু হয়। বিদ্রোহী গোষ্ঠী 'আরসা' পুলিশ পোস্টে হামলা চালানোর পর, মিয়ানমার সেনাবাহিনী তথাকথিত 'শুদ্ধি অভিযান'

শুরু করে। কিন্তু বিশ্ববাসী এর এক ভিন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করে। স্যাটেলাইট চিত্রে দেখা যায়, শত শত রোহিঙ্গা গ্রাম পুড়িয়ে ছাই করে দেওয়া হয়েছে; গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে তাদের ঘরবাড়ি, মসজিদ আর ফসলি জমি। অথচ পাশেই থাকা অ-রোহিঙ্গা জনপদগুলো ছিল একদম অক্ষত। প্রাণ বাঁচাতে সাত লাখেরও বেশি মানুষ সীমান্ত পেরিয়ে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়, যার ফলে গড়ে ওঠে বিশ্বের বৃহত্তম শরণার্থী শিবির। জাতিসঙ্ঘ এ ঘটনাকে 'জাতিগত নিধনের এক ধ্রুপদী উদাহরণ' হিসেবে আখ্যা দেয় এবং পরবর্তী সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণহত্যা' হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

নিপীড়নের পক্ষে যখন রক্ষক

আন্তর্জাতিক মহলে যখন নিন্দার ঝড় বইছিল, সু চির ভূমিকা তখন সবকিছু স্পষ্ট করে দিয়েছিল। জাতিসঙ্ঘের এক বিশাল তদন্তে যখন মিয়ানমারের সামরিক বাহিনীকে গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করা হয়, তখনও তিনি রহস্যজনকভাবে চুপ ছিলেন। ২০১৭ সালের সেই সংকটকে তিনি স্রেফ একটি 'নিরাপত্তা অভিযান' বলে চালিয়ে দেন। এমনকি ২০১৯ সালে আন্তর্জাতিক বিচার আদালতে মিয়ানমার সেনাকর্তাদের সাফাই গাইতে গিয়ে তিনি 'রোহিঙ্গা' শব্দটি উচ্চারণ পর্যন্ত করেননি; বরং তাদের 'রাখাইনের মুসলমান' বলে সম্বোধন করেন। মানবাধিকার সংগঠনগুলোর মতে, এই পরিচয় অস্বীকার করা ছিল মূলত রোহিঙ্গাদের অস্তিত্ব মুছে ফেলারই একটি সরকারি কৌশল। এমনকি তার প্রশাসন গণধর্ষণ ও নৃশংসতার ভয়াবহ খবরগুলোকে 'সাজানো নাটক' বা 'ভুয়া ধর্ষণ' বলে উড়িয়ে দিয়েছিল।

ভাগ্যের নির্মম পরিহাস

যে শাসনব্যবস্থাকে তিনি একসময় আগলে রেখেছিলেন, শেষ পর্যন্ত তা-ই তার কাল হয়ে দাঁড়াল। ২০২১ সালের ১ ফেব্রুয়ারি, যে সেনাবাহিনীকে তিনি আন্তর্জাতিক বিচার থেকে ঢাল হয়ে বাঁচিয়েছিলেন, তারাই এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতা কেড়ে নেয়। সংসদ অধিবেশন শুরুর ঠিক আগমুহূর্তে সু চিকে গ্রেফতার করা হয়। তার বিরুদ্ধে সাজানো হলো একের পর এক রাজনৈতিক মামলা–অবৈধভাবে ওয়াকিটকি রাখা থেকে শুরু করে করোনা বিধি লঙ্ঘন, দুর্নীতি আর নির্বাচনী জালিয়াতির মতো হরেক রকম অভিযোগ। লোকচক্ষুর আড়ালে রুদ্ধদ্বার আদালতে বছরের পর বছর বাড়ানো হলো তার সাজা। সম্প্রতি জান্তা সরকার তার ৩৩ বছরের কারাদণ্ড কমিয়ে ২৭ বছর করেছে, কিন্তু আশিঊর্ধ্ব এই নেত্রী এখনো বন্দি। বাইরের জগতের সাথে প্রায় সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন অবস্থায় তাকে কড়া পাহাড়ায় রাখা হয়েছে। তার নিজের ছেলেও মায়ের এই শোচনীয় অবস্থাকে 'নরকবাস' বলে অভিহিত করেছেন।

একটি সতর্কবার্তা

সু চির এই পতনের পেছনে এক চরম পরিহাস লুকিয়ে আছে। যে জেনারেলরা রোহিঙ্গা গণহত্যার মূল কারিগর ছিল, আজ তারাই সেই নারীকে বন্দি করে রেখেছে যিনি একসময় তাদের পাশেই দাঁড়িয়েছিলেন। নোবেলজয়ী এক বিশ্বনন্দিত নেত্রী থেকে আজ কারাবন্দি এক 'সহযোগীর' এই জীবন আমাদের এক কঠোর শিক্ষা দেয়: আপনি যদি অত্যাচারীদের আড়াল করেন, তবে শেষ পর্যন্ত আপনি নিজেই তাদের শিকারে পরিণত হতে পারেন–একাকী এবং অসহায় অবস্থায়।

আজ সু চি নিঃসঙ্গ, তার দীর্ঘদিনের সব অর্জন আজ ধূলিসাৎ। একসময় বিশ্বজুড়ে তার প্রতি যে অগাধ সহানুভূতি ছিল, তার নিজের নেওয়া ভুল সিদ্ধান্তের কারণেই তা আজ ফিকে হয়ে গেছে। অন্যদিকে, রোহিঙ্গাদের ভাগ্য এখনো অনিশ্চিত–ঘরবাড়ি হারিয়ে ছন্নছাড়া এই মানুষগুলোর ন্যায়বিচার পাওয়ার পথ আজও থমকে আছে। পৃথিবী হয়তো তার আপন গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু সেই সময়ের নীরবতার চড়া মাশুল আজও রয়ে গেছে। ■

জবাবদিহিহীন মানবাধিকার : কাশ্মির এবং বিশ্ববিবেকের ব্যর্থতা

গোলাম নবী ফাই, পিএইচডি
চেয়ারম্যান, ওয়ার্ল্ড ফোরাম ফর পিস অ্যান্ড জাস্টিস, আমেরিকা

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি আনালেনা বেয়ারবক ৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ প্রশ্ন তুলেছিলেন, "পৃথিবী যখন অশান্তিতে জ্বলছে, সজ্ঘাত ছড়িয়ে পড়ছে আর মানবাধিকার পদদলিত হচ্ছে–তখন কোথায় সেই জাতিসঙ্ঘ?"

জাতিসঙ্ঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস ১২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ বলেন, "শান্তি আজ অবরুদ্ধ। সজ্ঘাত বাড়ছেই, সাধারণ মানুষ চরম কষ্ট পাচ্ছে। মানবাধিকার আর আন্তর্জাতিক আইনগুলো আজ বারবার লঙ্ঘিত হচ্ছে।"

জাতিসঙ্ঘের সাবেক মানবাধিকার বিষয়ক হাই কমিশনার মিশেল ব্যাচেলেট সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন,

"মানবাধিকারের মর্যাদা কমে যাওয়া মানেই একটি বিশ্ব ক্রমশ অন্ধকারের অতীতে ফিরে যাওয়া।" এই কঠিন সত্যটি এক রূঢ় বাস্তবতাকে ফুটিয়ে তোলে: বিশ্বজুড়ে মানবাধিকার রক্ষার এত ঘোষণা আর অঙ্গীকার থাকা সত্ত্বেও, পৃথিবীর অনেক জায়গায় এই সুরক্ষা ব্যবস্থা আজও অত্যন্ত নড়বড়ে।

জাতিসঙ্ঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি হিসেবে রাষ্ট্রদূত ভলকান বোজকির কথা দিয়েছিলেন যে, অসহায় আর নিপীড়িত মানুষেরা যেন এই বিশ্বাস রাখে যে বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই গণতান্ত্রিক মঞ্চে তাদের কথা শোনা হবে। অথচ বাস্তব চিত্র হলো, বিশ্ব রাজনীতি আজও আদর্শের চেয়ে ক্ষমতার দাপটেই বেশি চলে–যার ফলে অসহায় মানুষগুলো কোনো প্রকৃত অভিভাবক পাচ্ছে না।

বিশ্বের এই দ্বিমুখী আচরণ ভারতের দখলকৃত কাশ্মিরের চেয়ে স্পষ্ট আর কোথাও নেই। সেখানে আন্তর্জাতিক মহলের নীরবতার সুযোগ নিয়ে এক কোটি ২০ লাখেরও বেশি সাধারণ মানুষের ওপর নির্বিচার জুলুম চালানো হচ্ছে।

মানবাধিকার ঘোষণার ৭৭ বছর : প্রতিশ্রুতি ও বাস্তবতা

বিশ্ব যখন মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণার ৭৭তম বার্ষিকী পালন করছে, তখনো এর মূল আদর্শ–সাম্য, স্বাধীনতা আর মর্যাদা–সারা বিশ্বে সমানভাবে সমাদৃত। এই আদর্শ ধর্ম, জাতি বা মতাদর্শের ঊর্ধ্বে। মানুষের সম্মান যখন সঙ্কটে পড়ে, তখন পৃথিবীর সব মানুষই এক কাতারে এসে দাঁড়ায়। কিন্তু এখানে এক অদ্ভুত বৈপরীত্য রয়েছে: ইতিহাসে আগে কখনো এত ঘটা করে মানুষের অধিকারের কথা ঘোষণা করা হয়নি, আবার একইসাথে এত নিষ্ঠুরভাবে তা লঙ্ঘনও করা হয়নি।

সারা বিশ্ব আজ সঙ্কটে জর্জরিত :

- মিয়ানমারে রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর অমানবিক নিপীড়ন
- সিরিয়ায় নির্বিচার গণহত্যা এবং লাখ লাখ মানুষের বাস্তুচ্যুত হওয়া
- ইয়েমেনের চরম মানবিক বিপর্যয়
- ফিলিস্তিনিদের নিজেদের ভাগ্য নির্ধারণের অধিকার কেড়ে নেয়া
- ৯ লাখ ভারতীয় সেনার বুটের নিচে কাশ্মিরিদের অবরুদ্ধ জীবন

এগুলো কেবল বিচ্ছিন্ন কোনো ব্যর্থতা নয়–বরং নৈতিক দায়বদ্ধতার এক চরম বিপর্যয়।

বিশ্বজুড়ে এর প্রতিবাদগুলোও দেখা যায় খুব বিক্ষিপ্ত আর বেছে বেছে; যা অনেক সময় মানবিক প্রয়োজনে না হয়ে বরং রাজনৈতিক স্বার্থে করা হয়। যতক্ষণ না পর্যন্ত বিশ্ববাসী রাজনীতি ভুলে সব জায়গায় গুরুতর নির্যাতনের শিকার হওয়া মানুষের পাশে দাঁড়ানোর দায়বদ্ধতা গ্রহণ করবে–ততক্ষণ মানবাধিকার রক্ষার এই চেষ্টাগুলো বৈষম্যমূলক এবং অন্যায় হিসেবেই থেকে যাবে।

জাতিসঙ্ঘের না রাখা প্রতিশ্রুতি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মতো ভয়াবহ ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেই লক্ষ্যেই জাতিসঙ্ঘ তৈরি হয়েছিল। তাই যেকোনো সঙ্ঘাত থামানো বা তার সমাধান করাই ছিল এর সবচেয়ে বড় দায়িত্ব।

কিন্তু এই মূল দায়িত্ব পালনের দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, জাতিসঙ্ঘের অর্জন খুবই হতাশাজনক। বসনিয়া, রুয়ান্ডা কিংবা সিরিয়া–যখনই বড় কোনো বিপর্যয় এসেছে, জাতিসঙ্ঘ বেশিভাগ সময় কেবল দর্শকের মতো হাত গুটিয়ে বসে ছিল। প্রতিবারই সময়মতো ব্যবস্থা না নেয়ায় ঝরে গেছে অসংখ্য নিরপরাধ প্রাণ। আজ কাশ্মিরের বেলাতেও সেই একই দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি আমরা দেখতে পাচ্ছি।

কাশ্মির : এক অমীমাংসিত বিবাদ ও অবহেলিত জনপদ

জাতিসঙ্ঘ নিরাপত্তা পরিষদের আলোচ্যসূচিতে থাকা অন্যতম পুরনো ও অমীমাংসিত সমস্যা হলো কাশ্মির। ১৯৪৮ সালে জাতিসঙ্ঘে তদারকিতে ভারত ও পাকিস্তান উভয় দেশই একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ গণভোটের ব্যাপারে একমত হয়েছিল, যাতে কাশ্মিরিরা নিজেরাই তাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করতে পারে। কিন্তু সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষা

করা হয়নি। কাশ্মিরের মানুষ কখনোই স্বেচ্ছায় ভারতের সাথে যোগ দেবে না–এটি বুঝতে পেরে দিল্লির সরকার নানা অজুহাতে সেই ভোট বন্ধ করে দেয়। জাতিসজ্ঘ এখনো কাশ্মিরকে একটি বিরোধপূর্ণ অঞ্চল হিসেবে স্বীকৃতি দিলেও তাদের প্রস্তাবগুলো আজও বাস্তবায়িত হয়নি। এটি প্রমাণ করে যে, রাজনৈতিক সদিচ্ছা না থাকলে বড় বড় প্রতিশ্রুতিও কতটা অসহায় হয়ে পড়ে।

এদিকে, কাশ্মিরিরা এক বিভীষিকাময় বাস্তবতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন, যেখানে নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হলো :

- বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড
- গুম বা বলপ্রয়োগপূর্বক নিখোঁজ করা
- পরিকল্পিত নির্যাতন এবং যৌন সহিংসতা
- গণহারে উদ্দেশ্যমূলক আটক বা গ্রেফতার
- সংবাদপত্রের ওপর সেন্সরশিপ এবং ভিন্নমত দমন

জাতিসজ্ঘের প্রস্তাবিত সমাধানগুলোর পক্ষে শান্তিপূর্ণভাবে কথা বলাকেও এখন সেখানে অপরাধ হিসেবে গণ্য করা হয়। বিশ্ববাসীর নজর এড়াতে ভারত সরকার বিদেশী গণমাধ্যমগুলোকে সেখানে নিষিদ্ধ করেছে এবং স্থানীয় সাংবাদিকদের ওপর দমন-পীড়ন চালাচ্ছে। 'কমিটি টু প্রটেক্ট জার্নালিস্টস (সিপিজে)' সতর্ক করে দিয়েছে যে, কাশ্মিরে স্বাধীন সাংবাদিকতা আজ বিলুপ্তির পথে। আন্তর্জাতিক মহলের পর্যবেক্ষণ না থাকায় এই সংকট আজ তাদের চোখের আড়ালেই থেকে যাচ্ছে, যারা হয়তো এটি জানলে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হতো।

পারমাণবিক বিস্ফোরণোন্মুখ কেন্দ্র : যা বিশ্ব উপেক্ষা করতে পারে না

এই নীরবতা মারাত্মক ঝুঁকি বয়ে আনছে। কাশ্মির আজ বিশ্বের সবচেয়ে বেশি সামরিকায়িত এবং পারমাণবিক যুদ্ধের আশঙ্কায় থাকা এক চরম অস্থির অঞ্চল। ভারত ও পাকিস্তান ইতোমধ্যে তিনটি বড় যুদ্ধে লড়েছে এবং প্রায় চতুর্থ একটি যুদ্ধের দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এসেছে–যার প্রতিবারই ছিল পারমাণবিক সজ্ঘাত ছড়িয়ে পড়ার গভীর আশঙ্কা।

সীমানা ছাড়িয়ে মানবিক বিপর্যয়ের এমন বড় ঝুঁকি আর কোনো সজ্ঘাত তৈরি করে না। আঞ্চলিক ভূ-রাজনীতিতে কাশ্মীরিদের কেবল দাবার ঘুঁটি হিসেবে ব্যবহার করা এমন এক বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে, যা সইবার ক্ষমতা মানবতার নেই। ইতিহাস আমাদের মনে করিয়ে দেয়: আগ্রাসনকে প্রশ্রয় দেওয়া মানেই শান্তি নয়। ১৯৩৮ সালে চেকোস্লোভাকিয়া এই কঠিন শিক্ষা পেয়েছিল–বিশ্ব যেন কাশ্মিরের ক্ষেত্রে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি না করে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ : শান্তির এক পরীক্ষিত পথ

আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের চর্চা অনেক দীর্ঘস্থায়ী সজ্ঘাতের সমাধান করেছে :

- নামিবিয়া
- পূর্ব তিমুর
- ইরিত্রিয়া
- কসোভো
- মন্টিনিগ্রো
- দক্ষিণ সুদান

এই প্রতিটি ক্ষেত্রেই দেশগুলো নিপীড়নমূলক শাসনের শিকার ছিল এবং আন্তর্জাতিক আইন ও জাতিসজ্ঘের সিদ্ধান্তের মাধ্যমেই তারা সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছে। কাশ্মিরও ন্যায়বিচার, স্থিতিশীলতা এবং মর্যাদা পাওয়ার জন্য সেই একই পথের দাবিদার।

করণীয় কী

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর) যদি কেবল কাব্যিক শব্দমালার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে একটি বিশ্বাসযোগ্য দলিল হিসেবে টিকে থাকতে হয়, তবে জাতিসজ্ঘকে অবশ্যই সেখানে পদক্ষেপ নিতে হবে যেখানে তাদের নিজস্ব প্রস্তাবগুলো লঙ্ঘিত হচ্ছে।

জাতিসজ্ঘ মহাসচিবের যা করা উচিত :

- কাশ্মির বিষয়ক একজন জাতিসজ্ঘ বিশেষ দূত নিয়োগ করা।
- কাশ্মিরি জনগণ–যারা এই সঙ্কটের প্রধান অংশীদার–তাদের সব ধরনের আলোচনায় পূর্ণ প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা।
- আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনের দায়ে ভারতীয় কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার আওতায় আনা। মানবাধিকার কোনো প্রতীকী পাওনা নয়; এটি একটি আইনি বাধ্যবাধকতা।

সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত

২০২৫ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান যখন পারমাণবিক যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে ছিল, তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প হস্তক্ষেপ করেন এবং একটি যুদ্ধবিরতি কার্যকর করেন–সেই সাথে কাশ্মির সমস্যার সমাধানে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেন। সেই উদ্যোগটি প্রমাণ করেছে যে, কূটনীতির মাধ্যমে বড় বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব। তবে কোনো কূটনৈতিক সুযোগের যদি সঠিক বাস্তবায়ন না হয়, তবে তা কেবল সঙ্কটের সাময়িক বিরতি হিসেবেই থেকে যায়। যদি মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেওয়া সঠিক হয়ে থাকে, তবে তা কার্যকর করার চেষ্টাও অব্যাহত রাখা উচিত।

শেষ কথা

মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) সেই প্রতিশ্রুতি ততক্ষণ পর্যন্ত অন্তঃসারশূন্যই থেকে যাবে, যতক্ষণ বিশ্ববাসী লাখ লাখ কাশ্মিরিকে অধিকারহীন, বিচারহীন এবং কণ্ঠহীন অবস্থায় বেঁচে থাকতে বাধ্য করবে। 'বিলম্বিত বিচার মানেই বিচারহীনতা'–মানবাধিকারের ক্ষেত্রেও এ কথাটি ধ্রুব সত্য। বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করার জন্য আরেকটি ট্র্যাজেডি বা বড় কোনো বিপর্যয়ের অপেক্ষায় থাকা উচিত নয়। কাশ্মিরিরা অন্য সব নিপীড়িত জাতির মতো কেবল তাদের ন্যায্য অধিকারটুকুই চায়–আর তা হলো নিজেদের ভবিষ্যৎ নিজেই নির্ধারণ করার অধিকার। ■

এপস্টাইন ফাইলস : যেভাবে পাশ্চাত্যের নৈতিক মুখোশ ধসে পড়েছে

জাভেদ আকবর
কলামিস্ট (টরেন্টো, কানাডা)
হিউমান রাইটস, মিলিটারিজম এবং মিডিয়া

জেফরি এপস্টাইন সংক্রান্ত নথিপত্র জনসমক্ষে আসার পর বিশ্বজুড়ে তীব্র আলোচনার সৃষ্টি হয়েছে। ভাষ্যকার ও বিশ্লেষকদের মতে, এই ফাইলগুলো কেবল একটি বিচ্ছিন্ন অপরাধের ঘটনা নয়, বরং পশ্চিমা অভিজাত শ্রেণির নৈতিক দেউলিয়ার এক গভীর প্রমাণ। এই কেলেঙ্কারিকে ব্যাপকভাবে একটি 'কাঠামোগত অবক্ষয়' হিসেবে দেখা হচ্ছে, যেখানে সম্পদ ও ক্ষমতা ব্যক্তিদের আইনের ঊর্ধ্বে কাজ করার সুযোগ করে দেয়, যা শেষ পর্যন্ত পশ্চিমা-কেন্দ্রিক প্রতিষ্ঠানগুলোর নৈতিক কর্তৃত্বকে ধূলিসাৎ করে দিচ্ছে।

লেখক এই নিবন্ধে অধ্যাপক এডওয়ার্ড সাঈদের যুগান্তকারী কর্ম 'ওরিয়েন্টালিজম'-এর ব্যাপক সহায়তা নিয়েছেন, যাতে

পশ্চিমা বিশ্বের সমগ্র বুদ্ধিবৃত্তিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মূলে থাকা সেই নৈতিক ছদ্মবেশ বা মুখোশটি উন্মোচিত করা যায়।

এডওয়ার্ড সাঈদের যুগান্তকারী গ্রন্থ 'ওরিয়েন্টালিজম'-এ উন্মোচিত বুদ্ধিবৃত্তিক বিকৃতি থেকে শুরু করে জেফরি এপস্টাইন কাণ্ডে প্রকাশিত নৈতিক পচন—পাশ্চাত্যের অত্যন্ত যত্ন সহকারে তৈরি করা সেই 'সচ্চরিত্রের ভাবমূর্তি' শেষ পর্যন্ত ধসে পড়েছে।

অধ্যাপক সাঈদ (১৯৩৫-২০০৩) সেই বুদ্ধিবৃত্তিক কাঠামোটি ভেঙে চুরমার করে দিয়েছেন, যার মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্ব ইসলাম ও মুসলিম সমাজকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন করত। ফিলিস্তিনি-আমেরিকান এই পণ্ডিত আধুনিক বিশ্বের সংস্কৃতি, পরিচয় এবং ক্ষমতা বোঝার ধরনে এক আমূল পরিবর্তন নিয়ে আসেন। তিনি উন্মোচন করেন যে, কীভাবে জ্ঞানকেই আধিপত্য বিস্তারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। তিনি প্রমাণ করেছেন যে, 'ওরিয়েন্ট' বা প্রাচ্য (মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকাসহ পূর্বদিকের দেশগুলো) কোনো পণ্ডিতদের আবিষ্কৃত বস্তুনিষ্ঠ বাস্তবতা ছিল না, বরং এটি ছিল একটি সুপরিকল্পিত কল্পনা—একটি আয়না যেখানে ইউরোপ তাদের নিজস্ব ভয়, কল্পনা এবং শ্রেষ্ঠত্বের ধারণা প্রতিফলিত করত।

মুসলিমদের তুলে ধরা হতো অযৌক্তিক, ইন্দ্রিয়পরায়ণ এবং অনগ্রসর হিসেবে, যাদের ওপর পশ্চিমা নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন রয়েছে; অন্যদিকে ইউরোপ নিজেকে উপস্থাপন করত যৌক্তিক, নৈতিক এবং সভ্য হিসেবে। সাঈদের সমালোচনা ছিল অত্যন্ত বিধ্বংসী: তিনি দেখিয়েছেন যে এই চিত্রায়নগুলো কোনো নির্দোষ প্রাতিষ্ঠানিক ভুল ছিল না, বরং এগুলো ছিল ক্ষমতার হাতিয়ার।

এই ধারণাগুলোই ঔপনিবেশিক শাসন, সাংস্কৃতিক অহমিকা এবং রাজনৈতিক হস্তক্ষেপকে বৈধতা দেয়ার জন্য ব্যবহার করা হতো।

পুরো একটি সভ্যতাকে ব্যঙ্গচিত্রে পরিণত করার মাধ্যমে পাশ্চাত্য তার নিজস্ব নৈতিক অসঙ্গতি এবং ঐতিহাসিক সহিংসতাকে আড়াল করে রেখেছিল। সাঈদ যুক্তি দিয়েছিলেন যে, 'ওরিয়েন্টালিজম' বা প্রাচ্যবাদ আসলে ইসলামকে বোঝার জন্য নয়, বরং পশ্চিমা আধিপত্য বজায় রাখার জন্য তৈরি করা হয়েছিল।

বর্তমানের দিকে তাকালে দেখা যায়, ইতিহাস এক তিক্ত পরিহাস বয়ে এনেছে। যখন মুসলিমদের নিরন্তরভাবে নৈতিকভাবে সন্দেহভাজন এবং সাংস্কৃতিকভাবে পশ্চাৎপদ হিসেবে চিত্রায়িত করা হচ্ছিল, তখন পাশ্চাত্যের নিজস্ব অভিজাত শ্রেণি—যারা নিজেদের নৈতিক ক্ষমতার দাবিদার বলে মনে করত—তারা আজ জনসমক্ষে উন্মোচিত হয়ে পড়েছে।

এপস্টাইন সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্যগুলো তাদের সেই ঘষামাজা এবং মার্জিত 'ভদ্রতার মুখোশ' ছিঁড়ে ফেলেছে।

সেখানে যা বেরিয়ে এসেছে তা কেবল একজন অপরাধীর কেলেঙ্কারি নয়, বরং এটি একটি সংরক্ষিত ব্যবস্থার ব্যবচ্ছেদ; যেখানে সম্পদ, ক্ষমতা এবং প্রভাব একত্রিত হয়ে শিকারিদের সুরক্ষা প্রদান করত।

অল্পবয়সী মেয়েদের পাচার করা হয়েছে, প্রলুব্ধ করা হয়েছে, লাঞ্ছিত করা হয়েছে এবং তাদের মুখ বন্ধ করে রাখা হয়েছে—কোনো দূরের 'অসভ্য' ভূখণ্ডে নয়, বরং পশ্চিমা ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে। ব্যক্তিগত জেট বিমান, বিলাসবহুল প্রাসাদ, গোপন দ্বীপ এবং আইনি মারপ্যাঁচে করা ধামাচাপা—সব মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল এই নৈতিক পচনের অবকাঠামো। টাকা দিয়ে কেনা হয়েছে সুযোগ; প্রভাব দিয়ে কেনা হয়েছে নীরবতা; আর ক্ষমতা দিয়ে কেনা হয়েছে দায়মুক্তি। এখানেই 'প্রাচ্যবাদ' বা ওরিয়েন্টালিজমের এক গভীর বৈপরীত্য লক্ষ্য করা যায়।

শত শত বছর ধরে পাশ্চাত্য মুসলিম সমাজগুলোকে যৌন বিকৃতি এবং নৈতিক অবক্ষয়ের আধার হিসেবে চিত্রায়িত করেছে। অথচ আজ আমরা পশ্চিমা সম্পদ ও প্রভাবের সর্বোচ্চ মহলেই সংঘবদ্ধ লালসা ও পৈশাচিকতা প্রত্যক্ষ করছি—যা ছিল সুসংগঠিত, সুপরিকল্পিত এবং এমন সব প্রতিষ্ঠান দ্বারা সুরক্ষিত, যাদের কাজ ছিল ন্যায়বিচার সমুন্নত রাখা।

সাঈদ উন্মোচন করেছেন যে, কীভাবে পশ্চিমা বিশ্ব আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে ইসলামের একটি বিকৃত চিত্র উদ্ভাবন করেছিল।

এপস্টাইন সংক্রান্ত তথ্যগুলো আরো বেশি অস্বস্তিকর কিছু উন্মোচিত করে: তা হলো, বিশ্বকে নীতি-নৈতিকতার সবক দিলেও পশ্চিমা অভিজাতরা তাদের সেই মার্জিত আবরণের নিচে চরম শোষণের লালনপালন করেছে।

ইসলামী শিক্ষা শালীনতা, জবাবদিহিতা এবং দুর্বলদের সুরক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করে। অথচ মুসলিমদের উপস্থাপন করা হয়েছিল সভ্যতার প্রতি হুমকি হিসেবে।

ইতোমধ্যে, বিশ্ব অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সংবাদমাধ্যমের কারিগররা—যারা অন্যদের মানবাধিকার নিয়ে উপদেশ দিতেন—নিজেরাই এমন সব অপরাধে জড়িয়ে ছিলেন যা মানবতার মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে।

'ওরিয়েন্টালিজম' বা প্রাচ্যবাদ ছিল মূলত বয়ান বা ন্যারেটিভকে নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখার একটি কৌশল।

অন্যদিকে, এপস্টাইন সংক্রান্ত চাঞ্চল্যকর তথ্যগুলো হলো সেই নিয়ন্ত্রণের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া। এই দু'টি বিষয় মিলে একটি চরম সত্য উন্মোচন করে: পাশ্চাত্য

যে নৈতিক আধিপত্যের কাঠামো তৈরি করেছিল, তা কখনোই সচ্চরিত্রের ওপর ভিত্তি করে ছিল না, বরং তা ছিল ক্ষমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। ক্ষমতা যখন কথা বলে, তখন সে নিজেকেই সঠিক বলে দাবি করে। কিন্তু ক্ষমতা যখন উন্মোচিত হয়, তখন তার ভণ্ডামি নগ্ন হয়ে পড়ে। এপস্টাইন ফাইলগুলো সমাজের সর্বোচ্চ শিখরে সক্রিয় এক বীভৎস ব্যবস্থাকে প্রকাশ করে দিয়েছে।

বিমানের যাতায়াত রেকর্ড, গোপন সমঝোতা এবং শিথিল আইনি চুক্তিগুলো দেখিয়ে দিয়েছে যে, সম্পদের সামনে ন্যায়বিচার কত গভীরভাবে নতি স্বীকার করতে পারে।

এপস্টাইন কোনো সমাজবিচ্যুত ব্যক্তি ছিলেন না–তিনি ছিলেন প্রেসিডেন্ট, রাজপুত্র, বিলিয়নেয়ার এবং তারকাদের একদম ঘনিষ্ঠ বলয়ের মানুষ। তার ব্যক্তিগত বিমান–যাকে শিউরে ওঠার মতো নামে 'ললিতা এক্সপ্রেস' ডাকা হতো–অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়েদের পাচার করত বিলাসবহুল প্রাসাদ এবং গোপনীয়তার জন্য বিশেষভাবে তৈরি একটি ব্যক্তিগত দ্বীপে।

পরবর্তী সময়ে ভুক্তভোগীরা সাক্ষ্য দিয়েছেন যে, তাদের পণ্যের মতো এক শক্তিশালী ব্যক্তির কাছ থেকে অন্যজনের কাছে হস্তান্তর করা হতো। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সবেমাত্র কিশোরী। বছরের পর বছর ধরে কিছুই হয়নি। অভিযোগগুলো গায়েব হয়ে যেত। তদন্ত থমকে যেত। আইনজীবীরাও অবিশ্বাস্যভাবে নমনীয় আচরণ করতেন।

ন্যায়বিচারের যে কলকব্জা অসহায়দের প্রতি অত্যন্ত নির্মম–তা অতি-ধনীদের প্রতি রহস্যজনকভাবে কোমল হয়ে পড়েছিল। এটি কেবল অযোগ্যতা ছিল না; এটি ছিল অপরাধের অংশীদারিত্ব। এমনকি সন্দেহজনক অবহেলার মধ্যে ফেডারেল হেফাজতে এপস্টাইনের মৃত্যু সেই লোকটির মুখ বন্ধ করে দিয়েছিল, যে অনেকের নাম ফাঁস করে দিতে পারত। তা সত্ত্বেও নথিপত্রগুলো টিকে আছে, যা সুযোগ-সুবিধা দ্বারা সুরক্ষিত এক অভিজাত শ্রেণির বিকৃত ও লালসাগ্রস্ত সংস্কৃতিকেই নিশ্চিত করে।

এটি হলো পশ্চিমা বিশ্বের 'নৈতিক নাট্যশালা'র চরম পতন। কয়েক দশক ধরে পশ্চিমা প্রতিষ্ঠানগুলো মুসলিম সমাজকে অনগ্রসর, নিপীড়ক এবং নৈতিকভাবে ত্রুটিপূর্ণ হিসেবে চিত্রায়িত করে এসেছে, আর নিজেদের উপস্থাপন করেছে মানবাধিকার ও মর্যাদার রক্ষক হিসেবে। অথচ সুরক্ষিত প্রাসাদ এবং ব্যক্তিগত দ্বীপের আড়ালে পশ্চিমা বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তিরাই গড়ে তুলেছিলেন যৌন শোষণের এক বিশাল বাণিজ্যিক ব্যবস্থা।

এটি দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য ছিল না; এটি ছায়ার আড়ালে লুকিয়েও ছিল না, বরং বিলাসিতার মোড়কে সাজানো ছিল। এপস্টাইন সংক্রান্ত প্রকাশনাগুলো অভাব বা নিরুপায় হয়ে করা কোনো অপরাধকে উন্মোচিত করে না; বরং এগুলো প্রকাশ করে বিলাসিতা-চালিত চরম পৈশাচিকতা ও নৈতিক স্খলনকে।

এগুলো এমন এক সংস্কৃতিকে উন্মোচিত করে যেখানে সবকিছুর–শরীর, নীরবতা এবং ন্যায়বিচার–একটি নির্দিষ্ট দাম ছিল। আর এর ক্রেতারা ছিলেন ঠিক সেই ব্যক্তিরাই যারা বৈশ্বিক নীতি নির্ধারণ করতেন, গণমাধ্যমের বয়ান নিয়ন্ত্রণ করতেন এবং বিশ্বকে নৈতিকতা নিয়ে সবক দিতেন।

প্রাচ্যবাদ বা ওরিয়েন্টালিজম একসময় বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে যা করেছিল–অর্থাৎ নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করতে অন্যদের বিকৃতভাবে উপস্থাপন–এপস্টাইন ফাইলগুলো নৈতিকভাবে তার ঠিক উল্টোটা করে দেখিয়েছে। পশ্চিমা সভ্যতার শ্রেষ্ঠত্বের সেই বিভ্রম আজ ধসে পড়েছে।

মুখোশ এখন উন্মোচিত। দীর্ঘকাল ধরে মুসলিম এবং অ-পশ্চিমা সমাজগুলোর ওপর যে 'বর্বরতা'র তকমা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, আজ তা দেখা যাচ্ছে বড় বড় পেন্টহাউস এবং রাজপ্রাসাদগুলোতে। এডওয়ার্ড সাঈদ সতর্ক করেছিলেন যে, ক্ষমতা তার নিজের সহিংসতাকে আড়াল করতে নানা ধরণের মিথ্যা বয়ান বা ন্যারেটিভ তৈরি করে।

এপস্টাইন কেলেঙ্কারি আজ তা প্রমাণ করে দিয়েছে। বছরের পর বছর ধরে পশ্চিমা বিশ্ব অন্যদের 'অনৈতিকতা'র গল্প শুনিয়ে বিশ্ববাসীর মনোযোগ সরিয়ে রেখেছিল–অথচ সেই সময়ে তাদেরই শাসক শ্রেণি বন্ধ দরজার আড়ালে সুনিপুণভাবে শোষণের জাল বুনেছে। এখন গল্পের অভিমুখ বদলে গেছে এবং ইতিহাসের মোড় নিজেদের দিকেই ঘুরেছে। আর এতে যা প্রকাশ পেয়েছে, তা কোনো নৈতিক নেতৃত্ব নয়, বরং তা হলো চরম নৈতিক দেউলিয়াত্ব। ■

সৃজনশীল চিন্তায় ইবনে খালদুনের শিক্ষা

মাহমুদ ধাওয়াদি
বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং আরবি, ইংরেজি ও ফরাসি ভাষায় ২০টিরও বেশি গ্রন্থের প্রণেতা, তিউনিসিয়া

মানুষের জ্ঞানের জগতে কীভাবে বড় মাপের সৃজনশীল ও প্রতিভাবান ব্যক্তি তৈরি হয়, তা বোঝার জন্য ‘জ্ঞানের সমাজতত্ত্ব’ নিয়ে চর্চা করা প্রয়োজন। দেখা যায়, সাধারণত তিনটি প্রধান বিষয় একজন মানুষকে অসাধারণ প্রতিভাবান করে তোলে : (ক) প্রচুর পড়াশোনা ও গভীর জ্ঞান (খ) সৃজনশীল কাজে উৎসাহিত করার মতো পরিবেশ (গ) ব্যক্তিত্বের বিশেষ কিছু চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য।

এই প্রবন্ধের মূল আলোকপাত বা ফোকাস দু’টি বিষয়ের ওপর। প্রথমত, ইবনে খালদুনের অর্জিত অগাধ ইসলামি জ্ঞান কীভাবে তার চিন্তার জগত বা বিশ্ববীক্ষাকে গড়ে তুলেছিল এবং এর ফলে কীভাবে তাঁর প্রখর সমাজবিজ্ঞানভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তিক মেধার বিকাশ ঘটেছিল, তা বিশ্লেষণ ও আলোচনা করা।

দ্বিতীয়ত, মুসলিম সংস্কৃতিতে যাকে ‘আকল-নকল মানস’ বলা হয়–যা জ্ঞান আহরণ ও সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় ঐশী জ্ঞানকে মানুষের বিচারবুদ্ধিপ্রসূত জ্ঞানের সাথে সমন্বিত করে–জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই পদ্ধতির নির্ভরযোগ্যতা বা গ্রহণযোগ্যতা কতটুকু তা মূল্যায়ন করা।

উভয় ক্ষেত্রেই (অগাধ জ্ঞান এবং আকল-নকল জ্ঞান) মূলত ‘হিউম্যান সিম্বলস’ বা মানবিক প্রতীকী (ভাষা, চিন্তা, ধর্ম, জ্ঞান/বিজ্ঞান, মিথ, আইন, সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ এবং রীতিনীতি) ভাণ্ডারের ফলাফল; যেখানে জ্ঞান/বিজ্ঞান এবং চিন্তা হলো এই মানবিক প্রতীকী ভাণ্ডারের গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এই দ্বিমুখী আলোকপাত করার কারণ হলো, এই প্রবন্ধে একদিকে ধরে নেওয়া হয়েছে যে, মহান বুদ্ধিবৃত্তিক মানস গঠনের জন্য অগাধ জ্ঞান অত্যন্ত মৌলিক একটি বিষয়, এবং উদ্দীপনামূলক বাহ্যিক পরিবেশ ও বিশেষ ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যগুলো মেধাবী মনন বিকাশে অপরিহার্য সহায়ক শক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়।

অন্যদিকে, আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষিত সমাজে 'আকল-নকল' মানসকে জ্ঞানের দুই শাখায় (বিজ্ঞান ও কলা) নির্ভরযোগ্য জ্ঞান প্রতিষ্ঠার মাধ্যম হিসেবে খুব একটা গ্রহণ করা হয় না। এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা বর্তমানে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক, কারণ প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী ইমানুয়েল ওয়ালারস্টাইন যেমনটি দাবি করেছিলেন–জ্ঞানের দুই শাখার মধ্যে জ্ঞানতাত্ত্বিক পুনর্মিলনের অভাবের কারণে বর্তমানে সামাজিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের নির্ভরযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন উঠছে। মুসলিম 'আকল-নকল' মানস কেবল জ্ঞানের এই দুই শাখার জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐক্যের জোরালো সমর্থনই করে না, বরং এটি মানুষের তৈরি জ্ঞান এবং ঐশী জ্ঞানের মধ্যকার ঐক্যেরও সুপারিশ করে।

ইবনে খালদুনের বহুমুখী জ্ঞান এবং সৃজনশীলতা

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইবনে খালদুন যেভাবে বুদ্ধিমত্তা ও দক্ষতার সাথে 'মানবীয় সামাজিক সংগঠন' বা সমাজবিজ্ঞানের উদ্ভাবন করেছিলেন, তা তাকে মানব ইতিহাসের এক অনন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাই তার সেই অগাধ জ্ঞানভাণ্ডার এবং 'আকল-নকল' (যুক্তি ও ঐশী জ্ঞানের সমন্বয়) ভিত্তিক চিন্তাধারা সম্পর্কে জানা এখন সময়ের দাবি।

মানবজাতির দীর্ঘ ইতিহাস এবং বিভিন্ন সভ্যতা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জ্ঞানের যেকোনো শাখায় বড় মাপের সৃজনশীল মানুষ হওয়ার পেছনে সবসময়ই একটি উন্নত মানের 'শিক্ষিত বা প্রাতিষ্ঠানিক জ্ঞান' কাজ করেছে। এর জন্য প্রধানত দু'টি বিষয় প্রয়োজন: প্রথমত, ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান এবং দ্বিতীয়ত, সংশ্লিষ্ট বিষয়ে গভীর পাণ্ডিত্য। যদিও মানুষের কিছু কিছু সৃজনশীল কাজের জন্য অক্ষরজ্ঞান বা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা সবসময় বাধ্যতামূলক নয়, কিন্তু জ্ঞানের বেশিভাগ শাখার ক্ষেত্রেই এটি অপরিহার্য। অর্থাৎ, মানববিদ্যার পরিধি বাড়াতে এবং নতুন উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে শিক্ষা বা অক্ষরজ্ঞান একটি মৌলিক হাতিয়ার।

সৃজনশীলতা বিষয়ক বিভিন্ন তত্ত্বেও জ্ঞান ও সৃজনশীলতার গভীর সম্পর্কের কথা বলা হয়েছে। মনোবিজ্ঞানী রবার্ট স্টার্নবার্গের মতে, এই সম্পর্কটি খুবই স্পষ্ট–একজন মানুষ যত বেশি জানবেন, তার পক্ষে নতুন কোনো সমাধান বের করা তত সহজ হবে। এই বিশাল জ্ঞানভাণ্ডার মানুষের মস্তিষ্কে এমন এক জটিল চিন্তাপ্রক্রিয়ার জন্ম দেয়, যা প্রায়শই অসাধারণ সব উদ্ভাবন বা প্রতিভার বিচ্ছুরণ ঘটায়।

তবে একে একটি তড়িঘড়ি সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে; কারণ এটি সৃজনশীলতার প্রক্রিয়ায় যুক্ত অন্য দু'টি উপাদানের (পরিবেশ ও ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্য) গুরুত্বকে কমিয়ে দেখায়। এই সতর্কতা সত্ত্বেও, ইবনে খালদুনের অগাধ ইসলামি জ্ঞান এবং তার তৈরি নতুন সমাজবিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কটি এই প্রবন্ধের মূল ভিত্তি হিসেবে কাজ করবে–যা সৃজনশীলতা বিষয়ক তত্ত্বগুলো যাচাই করার একটি ক্ষেত্র। সৃজনশীলতার একটি আদর্শ সংজ্ঞা হলো– মানুষের এমন এক সক্ষমতা যার মাধ্যমে সে প্রাপ্ত তথ্যের সীমাবদ্ধতা পেরিয়ে যেতে পারে এবং পুরনো সমস্যাগুলোকে নতুন ও চমৎকারভাবে উপস্থাপনের কল্পনা করতে পারে; যেমনটি স্টার্নবার্গ উল্লেখ করেছেন।

ইবনে খালদুনের শিক্ষা ও জ্ঞান

তিউনিসিয়ায় তার শৈশব ও কৈশোরে ইবনে খালদুন প্রধানত তিনটি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেন: (১) ইসলামি শিক্ষা, যার মধ্যে ছিল কুরআন বিজ্ঞান, হাদীস এবং ইসলামি আইনশাস্ত্র (ফিকাহ)–বিশেষ করে মালেকি মাযহাবের আইন; (২) আরবি ভাষা বিষয়ক বিজ্ঞান, যা ব্যাকরণ, শব্দরূপ (তসরীফ) এবং বাগ্মিতা বা অলঙ্কার শাস্ত্র (আল-বালাগাহ) নিয়ে আলোচনা করে এবং (৩) যুক্তিবিদ্যা, দর্শন, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও গণিত। তার শিক্ষকদের মধ্যে দু'জন সবচেয়ে বিশিষ্ট পন্ডিত ছিলেন আবু মুহাম্মদ ইবনে আবদ আল-মুহাইমিন আল-হাদরামি এবং আবু আবদিল্লাহ মুহাম্মদ আল-আবেলি। ইবনে খালদুন আল-হাদরামিকে ব্যাকরণ ও হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন মরক্কোর শ্রেষ্ঠ পন্ডিত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তার কাছ থেকে তিনি হাদীসের প্রধান ছয়টি কিতাব (সিহাহ সিত্তাহ) এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বইয়ের মৌলিক জ্ঞান অর্জন করেন।

তার দ্বিতীয় শিক্ষক আল-আবেলির কাছে তিনি 'আল-আসলিয়্যাইনি' বা দু'টি মৌলিক শাস্ত্র শিখেন : যা হলো যুক্তিবিদ্যা এবং দর্শন ও গণিতের সকল শাখা। আল-আবেলি এই বিষয়গুলোতে ইবনে খালদুনকে অত্যন্ত প্রতিভাবান হিসেবে খুঁজে পেয়েছিলেন।

ইবনে খালদুন নিজেই স্বীকার করেছেন যে, অতি শৈশব থেকেই তার মধ্যে জ্ঞান অর্জনের এক তীব্র আকাঙ্ক্ষা ছিল:

"একেবারে শৈশব থেকেই, এমনকি দুধ ছাড়ানোর সময় থেকেই, আমি জ্ঞান এবং সর্বোত্তম গুণাবলী অন্বেষণে কখনো ক্ষান্ত হইনি। তিউনিসিয়ায় সেই ভয়াবহ প্লেগ মহামারী আসার আগ পর্যন্ত আমি আমার পুরো সময়টি বিভিন্ন কোর্সে অংশ নিয়ে এবং পন্ডিতদের সান্নিধ্যে কাটিয়েছি। ওই মহামারীতে তিউনিসিয়ার বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি এবং আমার অধিকাংশ শিক্ষক মারা যান। ফলে, যারা এই মহামারী থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন, সেই সব পন্ডিত ও লেখকদের অধিকাংশই মরক্কোর উদ্দেশে দেশ ত্যাগ করেন... ।"

পরবর্তী সময়ে ইবনে খালদুন মরক্কোর ফেজ শহরে পুনরায় পড়াশোনা শুরু করার সুযোগ পান। সেই সময়ে আল-আন্দালুস (স্পেন) এবং তিউনিসিয়া থেকে আসা জ্ঞানী-গুণী ও লেখকদের প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল এই শহরটি। ফেজে ছিল তৎকালীন সময়ের সবচেয়ে

সমৃদ্ধ ইসলামি পাঠাগারগুলো। এমন একটি জ্ঞানদীপ্ত ও প্রেরণামূলক পরিবেশে অবস্থান ইবনে খালদুনের জ্ঞানের পরিধিকে আরো বিস্তৃত ও শক্তিশালী করেছিল এবং তার জ্ঞানতৃষ্ণাকে মিটিয়েছিল।

ইবনে খালদুনের প্রশংসিত প্রতিভা

উভয় সংস্কৃতির বিভিন্ন বিজ্ঞানে ইবনে খালদুনের উল্লিখিত শিক্ষাগত পটভূমি (যা হিউম্যান সিম্বল বা ঐঝ ভাণ্ডারের অংশ) তার বুদ্ধিবৃত্তিক মানস গঠনে গভীর প্রভাব ফেলেছিল। বুদ্ধিজীবী ও পণ্ডিতদের মধ্যে বিশ্বজুড়ে একটি ব্যাপক ঐক্যমত রয়েছে যে, ইবনে খালদুন এক মহান মেধার অধিকারী ছিলেন। পশ্চিমা বিশ্ব থেকে বিখ্যাত ব্রিটিশ ইতিহাসবিদ আর্নল্ড টয়েনবি ইবনে খালদুনের মেধা সম্পর্কে এভাবে বলেছেন : "তিনি (ইবনে খালদুন) ইতিহাসের এমন একটি দর্শন কল্পনা ও সূত্রবদ্ধ করেছেন যা নিঃসন্দেহে যেকোনো সময় এবং যেকোনো স্থানে যেকোনো মানুষের তৈরি এই ধরণের কাজের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" প্রাচ্য থেকে মরক্কোর মরহুম প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী এবং ইবনে খালদুনের চিন্তাধারার ওপর পিএইচডি করা লেখক আল-জাবরি তার 'মুকাদ্দিমাহ' গ্রন্থটিকে দেখেন একটি "পিরামিড সদৃশ ও সুসংহত কাঠামো" হিসেবে। তার মতে, এটি বিষয়বস্তুর দিক থেকে যেমন উন্নত চিন্তার ফসল, তেমনি এর অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলোর বিন্যাস এবং বিভিন্ন অংশের মধ্যে বিরাজমান সামঞ্জস্যও অতুলনীয়।

জ্ঞানের নৈতিকতা

ইবনে খালদুনের বুদ্ধিবৃত্তিক মানস গঠনে ইসলামি জ্ঞানভাণ্ডারের (যা মানুষের প্রতীকী ভাণ্ডার বা HS-এর অংশ) সুনির্দিষ্ট ভূমিকা বুঝতে হলে আমাদের তৎকালীন মুসলিম পণ্ডিতদের চিন্তা করার সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলোর দিকে তাকাতে হবে। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে এটি ধরে নেওয়া হয় যে, বর্তমান যুগে মুসলিম বিশ্বে পশ্চিমা আধিপত্য ও উপনিবেশ শুরুর অনেক আগেই ইবনে খালদুন তার 'নতুন বিজ্ঞান' (ইলম আল-উমরান আল-বাশারি) উদ্ভাবন করেছিলেন–যা মূলত সেই সময়ের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক কাঠামোর মধ্যেই গড়ে উঠেছিল। সেই ধ্রুপদী মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের চিন্তা ও মেধা মূলত জ্ঞান অর্জন এবং নতুন কিছু সৃষ্টির ক্ষেত্রে কুরআনের নৈতিক আদর্শ দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিল।

এই নৈতিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে নিচে সারসংক্ষেপ করা যেতে পারে :

১) কুরআন জ্ঞান অর্জন ও সৃষ্টির ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেয়। অবতীর্ণ হওয়া প্রথম কুরআনিক আয়াতগুলো এই মহাবিশ্বের সবকিছু সম্পর্কে বিস্তৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য শিক্ষা এবং নিরন্তর জ্ঞানচর্চার গুরুত্বকে জোরালোভাবে তুলে ধরে।

২) জ্ঞান অন্বেষণ ও এর উন্নয়নের লক্ষ্যে কুরআনের বাণী মুসলিম ও অমুসলিম উভয়কেই তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি অবলম্বনের আহ্বান জানায়: (ক) মহাবিশ্ব বা প্রকৃতি, (খ) মানব সভ্যতা ও সমাজের ঐতিহাসিক ঘটনাবলি এবং তাদের সামাজিক চরিত্রসমূহ এবং (গ) মানুষের স্বতন্ত্র প্রকৃতি।

৩) কুরআনের দৃষ্টিতে, প্রকৃত ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান একজন বিজ্ঞানী বা পণ্ডিতকে আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি অনুগত ও বিনয়ী করে তোলে– "আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে" (আল-কুরআন, সূরা ফাতির, আয়াত: ২৮)। ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিতে, ভালো ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জন করা একজন প্রকৃত বিজ্ঞানী বা পণ্ডিতের জন্য আধ্যাত্মিক মুক্তির কাজ। এটি আধুনিক পাশ্চাত্য মানসের দুই সংস্কৃতির চিন্তাধারার চেয়ে সম্পূর্ণ আলাদা।

৪) মানুষের জ্ঞান যত বিশাল ও বিস্তৃতই হোক না কেন, আল্লাহর অসীম, বৈশ্বিক ও নিশ্চিত জ্ঞানের তুলনায় তা সব সময়ই অত্যন্ত সীমিত (বর্তমানে করোনা মহামারী আধুনিক বিজ্ঞানের জন্য এখনো একটি বড় চ্যালেঞ্জ)।

৫) ঐশী জ্ঞান হলো পরম নির্ভরযোগ্য, নিশ্চিত এবং এই পৃথিবী ও মহাবিশ্বের সবকিছুর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক।

মুসলিমদের বুদ্ধি ও ঐশী জ্ঞানভিত্তিক (আকল-নকল) চিন্তাধারা

মুসলিমদের এই জ্ঞানতাত্ত্বিক বা 'মানবিক প্রতীকী' (HS) শিক্ষার সংক্ষিপ্ত পরিচয় থেকে এটি পরিষ্কার যে, ইবনে খালদুনের শিক্ষা ও জ্ঞানগত পটভূমি এবং তিনি যে সমাজগুলো নিয়ে গবেষণা করেছিলেন, উভয়ই ছিল প্রকৃতিগতভাবে পুরোপুরি ইসলামি।

একদিকে, তার সময়ে প্রচলিত বিভিন্ন ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শাখাগুলোতে (উভয় সংস্কৃতির) তার অগাধ ও উচ্চমানের পাণ্ডিত্য ছিল, যা তার 'মুকাদ্দিমাহ' গ্রন্থের ষষ্ঠ খণ্ডে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। অন্যদিকে, ইবনে খালদুনের ছিল অসংখ্য আরব মুসলিম সমাজ, উপজাতি, গোষ্ঠী ও সম্প্রদায় সম্পর্কে সরাসরি লব্ধ অভিজ্ঞতা, যা তিনি তার 'উমরান' বা সমাজতাত্ত্বিক মেধা দিয়ে বিশ্লেষণ করেছেন এবং সেগুলো নিয়ে লিখেছেন। অন্য কথায়, তার সামাজিক তত্ত্ব এবং মাঠপর্যায়ের বাস্তব জ্ঞান–উভয়ই ইসলামি আদর্শ দ্বারা অনুপ্রাণিত। তাই ইবনে খালদুনের বুদ্ধিবৃত্তিক মানস ছিল অনিবার্যভাবে এক বলিষ্ঠ মুসলিম মানস, যা একই সাথে ইসলামি শিক্ষিত সংস্কৃতি এবং আরব মুসলিম সমাজের বাস্তব অভিজ্ঞতার ফসল।

একজন মহান চিন্তাবিদ হিসেবে ইবনে খালদুনের মুসলিম পরিচয় নিয়ে গিব যে বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে কোনো

সন্দেহের অবকাশ নেই :

"ইবনে খালদুন কেবল একজন মুসলিমই ছিলেন না, বরং মুকাদ্দিমাহ-এর প্রায় প্রতিটি পৃষ্ঠাই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি ছিলেন মালেকি মাজহাবের একজন একনিষ্ঠ মুসলিম ফকিহ (আইনবিদ) এবং ধর্মতাত্ত্বিক। তার কাছে ইসলাম ধর্ম ছিল জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। শরীয়াহ-ই হলো একমাত্র সঠিক পথপ্রদর্শক।"

অন্যদিকে, লেখক এম. আল-শাকা নিশ্চিত করেছেন যে, ইবনে খালদুনের 'উমরান তত্ত্ব' শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত ইসলামি। ইবনে খালদুন যখন তার 'নতুন বিজ্ঞান' ধারণার ওপর বিদেশী প্রভাব অস্বীকার করেন, তখন তিনি নিজেও তার নিজস্ব এবং খাঁটি ইসলামি চিন্তাধারার দিকেই ইঙ্গিত করেছেন :

"আমরা এই বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতন হয়েছি আল্লাহর সাহায্যে এবং এর পেছনে এরিস্টটলের কোনো নির্দেশনা বা মোবেধানদের (পারস্যের ধর্মগুরু) কোনো শিক্ষা ছিল না।"

ইবনে খালদুনের মেধার এই ইসলামি বৈশিষ্ট্যগুলো তথাকথিত 'আকল-নকল' জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গিতে আরো স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিকভাবে, আরব মুসলিম সভ্যতার শুরুর দিকের সকল শাখার পণ্ডিত ও বিজ্ঞানীরা তাদের কাজ সম্পন্ন করেছিলেন একদিকে ওহী বা পবিত্র জ্ঞান (নকল) এবং অন্যদিকে মানুষের বিচারবুদ্ধি নির্ভর অর্জিত জ্ঞান (আকল)-এর সমন্বয়ের ভিত্তিতে। ইবনে খালদুনের মুকাদ্দিমাহ-তে প্রতিষ্ঠিত বহুমুখী সমাজবিজ্ঞানও এই আকল ও নকলের সমন্বয়ের নিয়মের বাইরে নয়। অর্থাৎ, তিনি তার মুকাদ্দিমাহ-সহ সমগ্র 'উমরান' বা সমাজতাত্ত্বিক কাজ রচনার ক্ষেত্রে এই দ্বৈত জ্ঞানতাত্ত্বিক (আকল-নকল) দৃষ্টিভঙ্গি জোরালোভাবে গ্রহণ করেছিলেন। এই হিসেবে, খালদুনীয় চিন্তাধারা আগে বর্ণিত ধ্রুপদী মুসলিম বুদ্ধিবৃত্তিক মানসের সেই পাঁচটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের সাথে পুরোপুরি সামঞ্জস্যপূর্ণ, যা মূলত কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত।

আকল (যুক্তি) এবং নকল (ঐশী জ্ঞান)—এই উভয় দৃষ্টিকোণ থেকে শেখার জন্য এমন চরম কৌতূহলী এবং অনুপ্রাণিত মানসিকতা মধ্যযুগের আগে আরব-মুসলিম সভ্যতার বিভিন্ন শাখায় অর্জিত বড় বড় মাইলফলকগুলো ব্যাখ্যা করতে সাহায্য করে। ইবনে খালদুনের 'মুকাদ্দিমাহ' গ্রন্থে ফুটে ওঠা তার অসাধারণ মেধা মূলত মুসলিমদের এই 'আকল-নকল' ভিত্তিক চিন্তাধারার উচ্চ বুদ্ধিবৃত্তিক সক্ষমতার একটি জোরালো উদাহরণ। এই বিশেষ ধরনের চিন্তাপদ্ধতিকেই আমরা তথাকথিত খালদুনীয় প্রাচ্য সমাজবিজ্ঞান এবং সমসাময়িক পাশ্চাত্য সমাজবিজ্ঞানের মধ্যকার বিভাজক রেখা বা পার্থক্য হিসেবে বিবেচনা করি। উদাহরণস্বরূপ, ইবনে খালদুন তার মুকাদ্দিমাহ-তে

ইবনে খালদুনের প্রতিকৃতি

জ্ঞানের দুই সংস্কৃতির (বিজ্ঞান ও মানবিক শাখা) মধ্যে যে জ্ঞানতাত্ত্বিক ঐক্য বা সমন্বয় ঘটিয়েছেন, তার জন্য সমাজবিজ্ঞানী ওয়ালারস্টাইনও তার প্রশংসা করবেন বলে আশা করা যায়।

ইসলামি জ্ঞানতাত্ত্বিক দৃষ্টিভিকোণ থেকে, আকল (যুক্তি) এবং নকল (ঐশী জ্ঞান)-এর মধ্যে কোনো উত্তেজনা বা বিরোধের স্থান মুসলিম মানসে নেই। কারণ, এই দু'টি সূত্রের উৎস এক এবং অভিন্ন : আল্লাহ। সেভাবে দেখলে, মুসলিম মানসকে পার্থিব (secular) এবং ঐশী (Revealed) জ্ঞানের একটি মিলনস্থল হিসেবে গণ্য করা যায়। বিখ্যাত ধর্মীয় পণ্ডিত আহমদ ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮) হলেন সবচেয়ে সুপরিচিত মুসলিম মনীষী, যিনি ইসলামি সংস্কৃতিতে আকল এবং নকলের সমন্বিত জ্ঞান প্রচারের বৈধতাকে জোরালোভাবে সমর্থন করেছিলেন। তার রচিত 'দর'উ তা'আরুদিল আকলি ওয়ান নাকলি' (আকল ও নকলের মধ্যকার বিরোধ নিরসন) গ্রন্থটি এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। ■

মোড় পরিবর্তন: বাংলাদেশের অর্থনীতির কৌশলগত পুর্নবিন্যাস

মোহাম্মদ কবির হাসান, পিএইচডি
অধ্যাপক, ফিন্যান্স, নিউ অরলিন্স বিশ্ববিদ্যালয়, ইউএস

বাংলাদেশ ২০২৬ সালে এক জটিল ও দ্বান্দ্বিক সামষ্টিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ২০২৪ সালের শ্বেতপত্রে (White Paper) প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, দেশের অর্থনীতি বর্তমানে কেবল সাময়িক সংকটে নেই, বরং এক গভীর স্ট্রাকচারাল ভালনারেবিলিটি বা কাঠামোগত ভঙ্গুরতার সম্মুখীন। প্রাতিষ্ঠানিক অবক্ষয়, সুশাসনের অভাব এবং ব্যাংকিং খাতের বিশৃঙ্খলা আজ সামষ্টিক অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ও সামাজিক সংহতির জন্য বড় হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

১. অর্থনৈতিক বাস্তবতা: হিসাব মেলানোর এক মুহূর্ত

রাজস্ব ভঙ্গুরতা : লাগামহীন বাজেট ঘাটতি এবং অদক্ষ সরকারি বিনিয়োগের ফলে সরকারি ঋণের বোঝা বিপজ্জনক পর্যায়ে পৌঁছেছে। কর-জিডিপি অনুপাত (tax-to-GOP ratio) স্থবির হয়ে থাকার মূল কারণ হলো সংকীর্ণ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীকে দেওয়া ঢালাও কর অব্যাহতি এবং ভ্যাট ও কাস্টমস প্রশাসনে ব্যাপক লিকেজ বা রাজস্ব চ্যুতি। বর্তমানে ঋণের কিস্তি (ডেব্ট সার্ভিসিং) মেটাতে গিয়ে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের মতো মানবসম্পদ উন্নয়ন খাতের ব্যয় সংকুচিত (Crowding out) হচ্ছে।

মূল্যস্ফীতি ও বাহ্যিক ঝুঁকি: মুদ্রার বিনিময় হার সমন্বয় এবং বাজার ব্যবস্থায় মার্কেট কনসেন্ট্রেশন বা সিন্ডিকেটের প্রভাবে মূল্যস্ফীতি এখনো ঊর্ধ্বমুখী। অন্যদিকে, রপ্তানির ক্ষেত্রে একক পণ্যের ওপর অতি-নির্ভরতা এবং রেমিট্যান্সের অস্থিরতা বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভকে ঝুঁকিপূর্ণ করে তুলছে।

ব্যাংকিং খাতের সিস্টেমিক রিস্ক: আর্থিক খাতের সবচেয়ে

বড় ঝুঁকি হলো নন-পারফর্মিং লোন (NPL) বা খেলাপি ঋণ। রাজনৈতিক প্রভাবে ঋণদান, দুর্বল ক্রেডিট অ্যাপ্রাইজাল এবং নিয়মনীতির শিথিলতা (Regulatory Forbearance) অনেক ব্যাংককে টেকনিক্যালি দেউলিয়া করে দিয়েছে। এছাড়া ক্যাপিটাল ফ্লাইট বা অর্থ পাচার এবং ট্রেড মিস-ইনভয়েসিং বা বাণিজ্যে কারচুপির মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ সঞ্চয় বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে।

২. কেন গ্রোথ মডেল বা প্রবৃদ্ধি কাঠামোর পরিবর্তন জরুরি?

বিগত আমলের প্রবৃদ্ধি মডেল ছিল ক্যাপিটাল-ইনটেনসিভ বা পুঁজি-নিবিড় এবং ডেব্‌ট-ফিন্যান্সড বা ঋণ-নির্ভর। মেগা প্রকল্পগুলোতে মাত্রাতিরিক্ত ব্যয় এবং লো এমপ্লয়মেন্ট ইলাস্টিসিটি বা কর্মসংস্থান সৃষ্টির নিম্ন হার অর্থনীতির জন্য হিতে বিপরীত হয়েছে। এলডিসি উত্তরণ পরবর্তী চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় বাংলাদেশকে এখন প্রোডাক্টিভিটি-লেড গ্রোথ বা উৎপাদনশীলতা-চালিত প্রবৃদ্ধির দিকে যেতে হবে। আমাদের নতুন লক্ষ্য হতে হবে: "বিফোর কনক্রিট, জবস; বিফোর প্রেস্টিজ, প্রোডাক্টিভিটি।"

৩. সংস্কারের কৌশলগত রোডম্যাপ

আর্থিক খাতের স্থিতিশীলতা: কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুপারভাইজরি ইন্ডিপেন্ডেন্স বা তদারকি স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত করতে হবে। দ্রুত খেলাপি ঋণ পুনঃতফসিলীকরণ বন্ধ করে রিক্যাপিটালাইজেশন বা পুনঃমূলধনীকরণ প্রক্রিয়ায় কঠোর শর্তারোপ করতে হবে। দীর্ঘমেয়াদী অর্থায়নের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার ওপর নির্ভরতা কমিয়ে ডোমেস্টিক বন্ড এবং সুকুক মার্কেট সম্প্রসারণ করতে হবে।

কর্মসংস্থান কেন্দ্রিক কৌশল: বছরে ২৫-৩০ লাখ কর্মসংস্থানের লক্ষ্যমাত্রা নিয়ে একটি ন্যাশনাল এমপ্লয়মেন্ট স্ট্র্যাটেজি প্রণয়ন করা প্রয়োজন। বিশেষ করে এগ্রো-প্রসেসিং, লাইট ম্যানুফ্যাকচারিং, ফার্মাসিউটিক্যালস এবং ডিজিটাল সার্ভিসের মতো উচ্চ উৎপাদনশীল খাতগুলোকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের (SME) জন্য সহজ শর্তে ঋণ এবং বিশেষ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার তৈরি করতে হবে।

ক্লাইমেট রেজিলিয়েন্স ও গ্রিন ফিন্যান্স: জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবিলায় গ্রিন সুকুক, ব্লেন্ডেড ফিন্যান্স এবং মিউনিসিপ্যাল বন্ডের মতো আধুনিক আর্থিক হাতিয়ার ব্যবহার করে টেকসই অবকাঠামো নির্মাণ করতে হবে। ব্যাংকিং তদারকিতে ক্লাইমেট স্ট্রেস টেস্টিং অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি।

ইসলামিক সোশ্যাল ফিন্যান্সের ভূমিকা: জাকাত, পেশাদার ওয়াকফ ব্যবস্থাপনা এবং কর্জ-এ-হাসানা তহবিলের মতো নৈতিক আর্থিক হাতিয়ারগুলো সরকারের রাজস্ব সক্ষমতার

পরিপূরক হতে পারে। স্বচ্ছ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এ খাত থেকে বছরে ১৫০-২০০ বিলিয়ন টাকা সংগ্রহ করে শিক্ষা ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা উন্নয়নে ব্যয় করা সম্ভব।

৪. সংস্কারের পর্যায়ক্রমিক ধাপ (Sequencing of Reforms)

১. প্রথম পর্যায় (২০২৬-২০২৭): ব্যাংকিং খাতের সংস্কার (Cleanup), মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ এবং দুর্নীতিবিরোধী কঠোর পদক্ষেপের মাধ্যমে সরকারের সক্ষমতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা পুনর্গঠন।

২. দ্বিতীয় পর্যায় (২০২৮-২০৩১): এসএমই ফিন্যান্সিং স্কেল-আপ করা, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ক্লাস্টার স্থাপন এবং জলবায়ু-সহনশীল অবকাঠামো নির্মাণ।

৩. তৃতীয় পর্যায় (২০৩২-২০৩৬): দক্ষ মানবসম্পদ ও বৈচিত্র্যময় রপ্তানি খাতের মাধ্যমে বাংলাদেশকে একটি ইথিক্যাল ফিন্যান্স এবং গ্রিন ইনভেস্টমেন্ট হাবে রূপান্তর করা।

উপসংহার

বাংলাদেশের সামনে সুযোগের জানালা খুবই ছোট। শ্বেতপত্র (২০২৪) আমাদের সিস্টেমিক ব্যর্থতার এক নির্মোহ রোগ নির্ণয় করেছে। এখন প্রয়োজন টেকসই এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধির দিকে কৌশলগত অবস্থান পরিবর্তন করা। যদি আমরা দৃঢ় নেতৃত্বের মাধ্যমে আর্থিক স্বচ্ছতা, সুশাসন এবং নৈতিক অর্থায়নকে অগ্রাধিকার দিতে পারি, তবেই বাংলাদেশ 'ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ড' কাজে লাগিয়ে একটি উচ্চ-আয়ের দেশে পরিণত হতে পারবে। অন্যথায় বৈষম্য ও ভঙ্গুরতার মিডল-ইনকাম ট্র্যাপে (মধ্যম আয়ের ফাঁদ) পড়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে। ■

বিশ্বজয়ের লক্ষ্যে তরুণ মেধা লালন

কর্নেল আশরাফ আল দীন
ভাইস চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক অ্যান্ড পিস স্টাডিজ (সিএসপিএস), ঢাকা, বাংলাদেশ।

আজকের এই আন্তঃসংযুক্ত বিশ্বে সাফল্য স্থানীয় সীমানাকে ছাড়িয়ে গেছে। একাডেমিক অলিম্পিয়াড এবং উদ্যোক্তা হওয়ার চ্যালেঞ্জ থেকে শুরু করে রোবোটিক্স প্রতিযোগিতা এবং আন্তর্জাতিক বিতর্ক–তরুণরা এখন বিশ্বমঞ্চে পা রাখছে, যেখানে জ্ঞান, সৃজনশীলতা এবং সহনশীলতার কঠোর পরীক্ষা নেওয়া হয়। এই মঞ্চগুলোতে পৌঁছানোর পথ প্রতিযোগিতার দিনের অনেক আগেই শুরু হয়–আর তা শুরু হয় তরুণ মেধাকে অত্যন্ত যত্নের সাথে লালন-পালনের মাধ্যমে।

বাংলাদেশের তরুণদের মধ্যে রয়েছে অফুরন্ত সুপ্ত প্রতিভা; সামান্য দিকনির্দেশনা এবং উৎসাহ পেলে এই তরুণদের বিশ্বমঞ্চে নিজেদের ছাপ রাখার সক্ষমতা রয়েছে।

কৌতূহলের ভিত্তি

শিশু-কিশোরদের বিশ্বমানের প্রতিযোগিতার জন্য প্রস্তুত করার প্রথম ধাপ হলো তাদের মধ্যে প্রকৃত কৌতূহল জাগিয়ে তোলা। যে শিশু গভীর প্রশ্ন করে, পাঠ্যবইয়ের বাইরে যাওয়ার সাহস রাখে এবং উদ্ভাবনী সমাধান খোঁজে, সে প্রাকৃতিকভাবেই একজন আত্মবিশ্বাসী প্রতিযোগীতে পরিণত হয়। অনুসন্ধান-ভিত্তিক শিক্ষা, নিয়মিত পড়ার অভ্যাস এবং বিজ্ঞান, সাহিত্য,

শিল্পকলা ও প্রযুক্তির মতো বৈচিত্র্যময় ক্ষেত্রের সান্নিধ্য বুদ্ধিবৃত্তিক প্রস্তুতির মূল ভিত্তি তৈরি করে। এই ভিত্তি অবশ্যই ঘর থেকে মা-বাবার উৎসাহের মাধ্যমে শুরু হতে হবে এবং স্কুল-কলেজে শিক্ষকদের সুচিন্তিত নির্দেশনায় তা অব্যাহত থাকতে হবে।

শিক্ষার বাইরে : সামগ্রিক দক্ষতা অর্জন

বৈশ্বিক প্রতিযোগিতাগুলো কেবল পুঁথিগত মেধার চেয়ে আরো বেশি কিছু দাবি করে। এগুলোর জন্য প্রয়োজন শক্তিশালী যোগাযোগ দক্ষতা, দলগত কাজ করার ক্ষমতা, খাপ খাইয়ে নেয়ার দক্ষতা এবং মানসিক দৃঢ়তা–যা সাধারণত শ্রেণিকক্ষের বাইরের বিভিন্ন সহ-শিক্ষা কার্যক্রমের মাধ্যমে অর্জিত হয়। উদাহরণস্বরূপ, গণিতে পারদর্শী একজন শিক্ষার্থীকে অবশ্যই অন্যদের সাথে কার্যকরভাবে মিলেমিশে কাজ করা এবং নিজের ধারণাগুলো স্পষ্টভাবে প্রকাশ করতে শিখতে হবে। তাই তরুণ মেধাকে লালন করার অর্থ হলো নেতৃত্ব দেয়ার সুযোগ, সাংস্কৃতিক বিনিময় কর্মসূচি, খেলাধুলা এবং সৃজনশীল চারুকলার ক্ষেত্র তৈরি করা। এই অভিজ্ঞতাগুলো সেই 'সফট স্কিল' বা সূক্ষ্ম দক্ষতাগুলো তৈরি করে, যা একজন ব্যক্তিকে মানসিকভাবে সমৃদ্ধ এবং প্রতিযোগিতামূলক করে তোলে।

মেন্টরশিপ এবং দিকনির্দেশনার ভূমিকা

প্রত্যেক সফল তরুণ অর্জনকারীর পেছনে একজন মেন্টর বা পথপ্রদর্শক থাকেন, যিনি শুরুতেই প্রতিভাটি শনাক্ত করেন এবং মমতা ও প্রজ্ঞা দিয়ে তাকে পরিচালনা করেন। এই প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শিক্ষক, প্রশিক্ষক এমনকি সহপাঠীরাও অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। সুশৃঙ্খল মেন্টরশিপ কেবল বিষয়ভিত্তিক জ্ঞানই গভীর করে না, বরং শৃঙ্খলাবোধ, সময়ের ব্যবস্থাপনা এবং চাপের মুখে সমস্যা সমাধানের ক্ষমতাও তৈরি করে। বিশ্বমঞ্চে জয়ী হয়েছেন এমন রোল মডেলদের সান্নিধ্য তরুণদের সংকল্প এবং লক্ষ্যকে আরো শাণিত করতে পারে।

প্রযুক্তি এবং বৈশ্বিক সান্নিধ্য

ডিজিটাল যুগে কোনো শিশুই এখন বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্মগুলো শিক্ষার্থীদের ঘরে বসেই কোডিং প্রতিযোগিতা, মডেল ইউনাইটেড নেশনস (গটঘ) কনফারেন্স বা ভাষা প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়ার সুযোগ করে দেয়। এই অভূতপূর্ব সুযোগ তাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে এবং বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে চিন্তা করতে শেখায়। অভিভাবক এবং শিক্ষকদের উচিত প্রযুক্তির দায়িত্বশীল ব্যবহারে উৎসাহ দেওয়া এবং তরুণ শিক্ষার্থীদের ডিজিটাল টুলগুলো যোগাযোগ, সহযোগিতা এবং গঠনমূলক প্রতিযোগিতার কাজে ব্যবহার করতে পথ দেখানো। অপব্যবহারের ভয় যেন কখনো জ্ঞানের বিশাল জগতে প্রবেশের পথে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়–এক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ নয়, সঠিক দিকনির্দেশনাই হলো আসল চাবিকাঠি।

> আমাদের তরুণদের শুধু প্রতিযোগিতায় জয়ের জন্যই সক্ষম করে তুলি না–বরং তারা হয়ে ওঠে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং সম্মিলিত অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে গড়া এক আগামীর কারিগর

চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সহনশীলতা

প্রতিযোগিতা মানেই কেবল জয় নয়; এটি সমানভাবে প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে শেখার বিষয়। অনেক তরুণ অংশগ্রহণকারী সাফল্যের স্বাদ পাওয়ার আগে ব্যর্থতার সম্মুখীন হয়। তাদের সহনশীলতা, অধ্যবসায় এবং প্রবৃদ্ধিমূলক মানসিকতার শিক্ষা দিলে তারা হতাশাকে বাধা হিসেবে না দেখে বরং এগিয়ে যাওয়ার সিঁড়ি হিসেবে দেখতে শেখে। একটি সহায়ক পরিবেশ উৎসাহ এবং গঠনমূলক সমালোচনার মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখে, যা শিশুদের যেকোনো চ্যালেঞ্জকে উন্নতির সুযোগে পরিণত করতে সক্ষম করে তোলে। প্রতিযোগিতার এই যাত্রায় হতাশার কোনো দীর্ঘস্থায়ী স্থান নেই।

বিশ্ব নাগরিকত্বের পথে

পরিশেষে, বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার জন্য তরুণ মেধাকে প্রস্তুত করা কেবল পদক এবং স্বীকৃতির মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। এটি এমন নাগরিক গড়ে তোলার বিষয় যারা যুক্তি দিয়ে চিন্তা করতে পারে, কার্যকরভাবে যোগাযোগ করতে পারে এবং বিশ্বের জরুরি চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবিলায় অর্থবহভাবে যুক্ত হতে পারে। এই অঙ্গনগুলোতে অংশগ্রহণের মাধ্যমে তরুণরা তাদের দেশ ও সংস্কৃতির দূত হয়ে ওঠে–তারা বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে শেখার পাশাপাশি মানবজাতির সাধারণ সমস্যাগুলোর উদ্ভাবনী সমাধানও প্রদান করে।

উপসংহার

বৈশ্বিক উৎকর্ষের এ যাত্রা শুরু হয় পরিবারে, শ্রেণিকক্ষে এবং এমন সব জনসমষ্টির মাঝে যারা তরুণ মেধাকে লালন করার গুরুত্ব বোঝে। কৌতূহল জাগিয়ে তোলা, সামগ্রিক বিকাশে সহায়তা করা, একনিষ্ঠ দিকনির্দেশনা প্রদান এবং প্রযুক্তিকে গ্রহণ করার মাধ্যমে আমরা পরবর্তী প্রজন্মকে কেবল প্রতিযোগিতার জন্যই নয়, বরং দ্রুত পরিবর্তনশীল এই বিশ্বে নেতৃত্ব দেয়ার জন্য প্রস্তুত করি। এভাবে আমরা আমাদের তরুণদের শুধু প্রতিযোগিতায় জয়ের জন্যই সক্ষম করে তুলি না–বরং তারা হয়ে ওঠে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং সম্মিলিত অগ্রগতির ওপর ভিত্তি করে গড়া এক আগামীর কারিগর, যা একটি অধিকতর বাসযোগ্য এবং সুশৃঙ্খল বিশ্ব গঠনে অবদান রাখে। ■

ইসলাম ও মানবাধিকার : সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের সাথে অভিন্ন যোগসূত্র

তাসনুভা জাহান
সহকারী অধ্যাপক, আইন ও বিচার বিভাগ,
নর্থ ইস্ট ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ।

বর্তমান যুগে মানবিক মর্যাদা, সাম্য এবং ন্যায়বিচার নিয়ে বিশ্বজুড়ে যে বিতর্ক চলছে, তা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও দেশীয় নীতি নির্ধারণে বড় ভূমিকা রাখছে। এই প্রেক্ষাপটে ইসলাম এবং আধুনিক মানবাধিকারের মেলবন্ধন বিভিন্ন সভ্যতার মাঝে বিদ্যমান অভিন্ন মূল্যবোধগুলো বোঝার জন্য একটি চমৎকার মাধ্যম হতে পারে।

১৯৪৮ সালে জাতিসঙ্ঘ কর্তৃক গৃহীত 'মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর)' একটি ঐতিহাসিক ধর্মনিরপেক্ষ রূপরেখা হিসেবে স্বীকৃত, যা মানুষের বিবেক ও মর্যাদাবোধের ওপর ভিত্তি করে তাদের অবিচ্ছেদ্য অধিকারগুলোকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে।

একইভাবে, ইসলামি শিক্ষা–যা পবিত্র কুরআন এবং মহানবী হযরত মুহাম্মদ সা:-এর সুন্নাহ থেকে প্রাপ্ত–মানবিক অধিকারের একটি ঐশ্বরিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে। এই অধিকারগুলো নৈতিক দায়িত্ব, সামাজিক ন্যায়বিচার এবং আল্লাহর নিকট জবাবদিহিতার ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত।

যদিও এই দু'টি ব্যবস্থার উৎস ভিন্ন–একটি মানুষের ঐকমত্য এবং অন্যটি ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশ–তবুও মৌলিক মানবিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তারা চমৎকারভাবে একবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, মানবতার সার্বজনীন আদর্শগুলো বিভিন্ন বিশ্বদর্শনের মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করতে পারে।

জীবনের অধিকার

উভয় আদর্শেই (ইসলাম ও মানবাধিকার) জীবনের অধিকারকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ইসলাম মানবজীবন রক্ষায় অত্যন্ত কঠোর অবস্থান নেয়; পবিত্র কুরআনে (৫:৩২) ঘোষণা করা হয়েছে যে, একজন নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করা মানে পুরো মানবজাতিকেই হত্যা করা, আর একজনের প্রাণ বাঁচানো মানে পুরো মানবজাতিকে বাঁচানো। মহানবী সা: তাঁর বিদায় হজের ভাষণেও অন্যের রক্ত, সম্পদ বা সম্মানের ক্ষতি করাকে নিষিদ্ধ করে এই অধিকারটিকে আরো জোরালোভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। একইভাবে, মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ৩ নম্বর অনুচ্ছেদে জীবন, স্বাধীনতা এবং নিরাপত্তার অধিকার নিশ্চিত করা হয়েছে। পাশাপাশি ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন বা নিষ্ঠুর আচরণের শিকার করা নিষিদ্ধ করা হয়েছে–যা জীবন রক্ষা এবং শারীরিক অখণ্ডতা বজায় রাখার ক্ষেত্রে উভয় ব্যবস্থার এক অভিন্ন নৈতিক অঙ্গীকারকে ফুটিয়ে তোলে।

মানবিক সমতা

আল্লাহর কাছে এবং মানবতার দৃষ্টিতে 'সবার সমান অধিকার' হলো এই দর্শনের অন্যতম মূল ভিত্তি। পবিত্র কুরআনে

(৪৯:১৩) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, মানুষকে এক নারী ও পুরুষ থেকে সৃষ্টি করে বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে বিভক্ত করা হয়েছে যেন তারা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পারে। এখানে মর্যাদার একমাত্র মাপকাঠি হলো সততা ও খোদাভীতি; যা বংশ, গোত্র বা সামাজিক উঁচু-নিচুর সব ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে দেয়। মহানবী সা: স্বাধীন মানুষকে দাস বানানো বা শ্রমিকের মজুরি আটকে রাখার মতো শোষণমূলক কাজের তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। এটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ১ম অনুচ্ছেদেরই প্রতিধ্বনি, যেখানে বলা হয়েছে- সব মানুষ স্বাধীনভাবে এবং সমান মর্যাদা ও অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। একইভাবে এটি ২য় অনুচ্ছেদের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ, যা জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ধর্ম বা বংশের ভিত্তিতে যেকোনো বৈষম্যকে নিষিদ্ধ করে।

শিক্ষার অধিকার

পবিত্র কুরআনের বারবার করা আহ্বান–যেমন: 'পড়ো,' 'চিন্তা করো' এবং 'জ্ঞান অর্জন করো'–এর মাধ্যমে ইসলামে জ্ঞান অন্বেষণকে বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়েছে। এটি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ২৬ নম্বর অনুচ্ছেদের সাথে পুরোপুরি সংগতিপূর্ণ, যেখানে শিক্ষার অধিকারকে ব্যক্তিগত উন্নয়ন এবং অন্যান্য অধিকার লাভের একটি অপরিহার্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ন্যায়বিচারের অধিকার

উভয় ক্ষেত্রেই ন্যায়বিচার আপসহীন। পবিত্র কুরআনের আয়াত (যেমন: ৫:৮) বিশ্বাসীদের নির্দেশ দেয় যেন তারা ন্যায়বিচারের পথে অবিচল থাকে, এমনকি তা যদি নিজের শত্রুর বিরুদ্ধেও হয়। এই নীতি মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ৭ নম্বর অনুচ্ছেদেরই প্রতিচ্ছবি, যা আইনের চোখে সবার সমান অধিকার এবং বৈষম্যহীন আইনি সুরক্ষাকে নিশ্চিত করে।

মৌলিক চাহিদা পূরণের অধিকার

ইসলামে সামাজিক কল্যাণ এবং মৌলিক চাহিদা পূরণ করা একটি আবশ্যিক কর্তব্য। পবিত্র কুরআনে (৫১:১৯) ধনীদের সম্পদে অভাবগ্রস্তদের অধিকার নির্ধারণ করে দেওয়া হয়েছে, যা পারস্পরিক সামাজিক সহযোগিতাকে উৎসাহিত করে। একইভাবে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ২২ ও ২৫ নম্বর অনুচ্ছেদে সামাজিক নিরাপত্তা এবং খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসাসহ উন্নত জীবনযাত্রার অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে।

ধর্মীয় স্বাধীনতা

পবিত্র কুরআনের বিখ্যাত ঘোষণা (১০৯:৬)–'তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) তোমাদের জন্য এবং আমার দ্বীন আমার জন্য'–এর মাধ্যমে ইসলামে ধর্মীয় স্বাধীনতার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে, যেখানে বিশ্বাস গ্রহণের ক্ষেত্রে কোনো জবরদস্তির স্থান নেই। একইভাবে, মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ১৮ নম্বর অনুচ্ছেদে মানুষের চিন্তা, বিবেক ও ধর্মের স্বাধীনতা এবং নিজের বিশ্বাস পরিবর্তনের অধিকারকে সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে।

আশ্রয়ের অধিকার

নির্যাতিতদের জন্য আশ্রয় লাভের অধিকারকে পবিত্র কুরআনের (৯:৬) বাণীর মাধ্যমে সমর্থন জানানো হয়েছে, যেখানে আশ্রয়প্রার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এটি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ১৪ নম্বর অনুচ্ছেদেরই অনুরূপ, যা যেকোনো ধরনের নিপীড়ন থেকে বাঁচতে অন্য দেশে আশ্রয় খোঁজার অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়।

সংখ্যালঘু অধিকার

ইসলামি আইনে সংখ্যালঘুদের বিশেষ সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে; যেখানে অমুসলিমদের অনেক ক্ষেত্রেই তাদের নিজস্ব ধর্মীয় ও ব্যক্তিগত আইন অনুসরণ করার পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে (কুরআন ৫:৪৭)। এটি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ১ম ও ২য় অনুচ্ছেদের মতোই সবার জন্য সমান অধিকার এবং সব ধরনের বৈষম্য দূর করার নিশ্চয়তা দেয়।

ব্যক্তিগত গোপনীয়তা, পবিত্রতা ও নিরাপত্তার অধিকার

ইসলামে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং এর পবিত্রতাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। অন্যের ব্যক্তিগত বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করা, গিবত বা পরনিন্দা করা (৪৯:১২) এবং অনুমতি ছাড়া অন্যের ঘরে প্রবেশ করা (২৪:২৭) ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। এটি মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্রের (ইউডিএইচআর) ১২ নম্বর অনুচ্ছেদেরই অনুরূপ, যা ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার বা বাসস্থানে অনধিকার চর্চা বা হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সুরক্ষা প্রদান করে।

উপসংহার

ইসলাম এবং মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র (ইউডিএইচআর)–তাদের ভিন্ন উৎস (একটি ঐশ্বরিক নির্দেশনা এবং অন্যটি ধর্মনিরপেক্ষ ঐকমত্য) সত্ত্বেও–মানবিক মর্যাদা, সাম্য, ন্যায়বিচার এবং জনকল্যাণের প্রতি গভীর শ্রদ্ধার প্রশ্নে একবিন্দুতে মিলিত হয়েছে। এই অভিন্ন নীতিগুলো ধর্মীয় মূল্যবোধ এবং আন্তর্জাতিক কাঠামোর মধ্যে সমন্বয়ের এক উজ্জ্বল সম্ভাবনাকে তুলে ধরে, যা বৈচিত্র্যময় এই বিশ্বে পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব ও সমঝতা বৃদ্ধিতে সহায়ক। এই মিলগুলো চিহ্নিত করার মাধ্যমে সমাজগুলো যেমন শাশ্বত আধ্যাত্মিক শিক্ষা থেকে শক্তি অর্জন করতে পারে, তেমনি আধুনিক বৈশ্বিক মানদণ্ডকেও গ্রহণ করতে পারে; যার ফলে মানবাধিকারের চর্চা আরো বেশি অন্তর্ভুক্তিমূলক ও সুদৃঢ় হবে। ■

ইসলামি মনোবিজ্ঞান : কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে একটি পর্যালোচনা

সাজাদ আহমদ পাদ্দাই, পিএইচডি
ভারতের আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইসলামি স্টাডিজে পিএইচডি সম্পন্ন এবং দু'টি গ্রন্থের প্রণেতা, কাশ্মির

মনোবিজ্ঞান হলো বিভিন্ন প্রেক্ষাপটে মানুষের মানসিক প্রক্রিয়া, অভিজ্ঞতা এবং আচরণের পদ্ধতিগত বা বৈজ্ঞানিক অধ্যয়ন। এটি মানুষের ভেতরের বিষয়গুলো–যেমন চিন্তা, বিশ্বাস, অনুভূতি, সংবেদন এবং উপলব্ধি–বিশ্লেষণের পাশাপাশি সরাসরি দেখা যায় এমন কাজ বা আচরণগুলো নিয়েও গবেষণা করে। মনোবিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য হলো মানুষের আচরণ, মানসিক প্রক্রিয়া এবং আবেগসমূহ বর্ণনা করা, ব্যাখ্যা করা, সে সম্পর্কে পূর্বাভাস দেওয়া এবং ইতিবাচক প্রভাব বিস্তার করা। ঐতিহাসিকভাবে, 'মনোবিজ্ঞান' (Psychology) শব্দটি ১৫৯০ সালে রুডলফ গোয়েকল প্রথম ব্যবহার করেন। এটি গ্রিক শব্দ 'সাইকি' (Psyche-আত্মা) এবং 'লোগোস' (Logos-অধ্যয়ন বা জ্ঞান) থেকে এসেছে, যার আদি অর্থ ছিল 'আত্মার বিজ্ঞান'। সময়ের সাথে সাথে এই ধারণাটি পরিবর্তিত হয়ে বর্তমানে 'মনের বিজ্ঞান'-এ পরিণত হয়েছে।

মনোবিজ্ঞানের একটি মূল বিতর্ক আবর্তিত হয় নির্ধারণবাদ বনাম স্বাধীন ইচ্ছা-কে কেন্দ্র করে: মানুষের আচরণ কি

কেবলই কার্যকারণ সম্পর্কের একটি শৃঙ্খল (যা প্রায়শই প্রাকৃতিক স্বভাব এবং সীমিত স্বাধীন ইচ্ছার সাথে যুক্ত), নাকি এর পেছনে মানুষের প্রকৃত দায়বদ্ধতা ও স্বাধীন ইচ্ছা কাজ করে? দৃশ্যমান কারণগুলোর ওপর বিজ্ঞানের এই অতিরিক্ত গুরুত্ব প্রদান কখনো কখনো ধর্মীয় ব্যাখ্যাগুলোর সামনে চ্যালেঞ্জ তৈরি করে, যার মধ্যে মানুষের জবাবদিহিতা ও স্বাধীন ইচ্ছা সংক্রান্ত ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গিও রয়েছে।

মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

ইসলাম এমন একটি জীবনদর্শন উপস্থাপন করে যা মূলত পশ্চিমা বস্তুবাদের বিপরীত। ইসলাম অনুযায়ী, মানুষ এবং সকল সৃষ্টি মহান আল্লাহর মাধ্যমে অস্তিত্ব লাভ করেছে; তিনি কেবল সৃষ্টিকর্তাই নন, বরং এই মহাবিশ্বের পালনকর্তা এবং নিয়ন্ত্রকও। মানবজীবনের একটি ঐশী ও মহত্তর উদ্দেশ্য রয়েছে: আর তা হলো ইহকালের সকল কাজের জন্য পরকালে জবাবদিহিতা। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে মানুষের প্রকৃতি দ্বিমুখী–বস্তুগত (দেহ) এবং আধ্যাত্মিক (আত্মা); আর মানুষকে এই উভয় দিকের মধ্যেই ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করতে হবে।

ইসলামি আইন (শরীয়াহ) মূলত এই ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যই ঐশীভাবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তৈরি করা হয়েছে। এটি বর্তমান সময়ে একটি খাঁটি ইসলামি মনোবিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব দেয়, যার আদর্শ, নীতি, পদ্ধতি এবং কাঠামো ধর্মনিরপেক্ষ অনুমানের পরিবর্তে ইসলামি জীবনদর্শনের ওপর ভিত্তি করে তৈরি হবে।

প্রাচীন মুসলিম পণ্ডিতরা মনোবিজ্ঞানের বিভিন্ন ধারণা নিয়ে নীতিশাস্ত্র (আখলাক), আকীদা এবং ফিকহ শাস্ত্রের আলোকে আলোচনা করেছেন। এই বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু কাজ হলো আল-মাওয়ার্দীর 'আদাব আদ-দীন ওয়া আদ-দুনিয়া', ইবনুল কাইয়্যিমের 'মাদারিজুস সালিকীন', আল-গাজ্জালীর 'ইহইয়াউ উলূমিদ্দীন', এবং শাহ ওয়ালিউল্লাহর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' ও 'আল-বুদুর আল-বাযিগাহ'। এই গ্রন্থগুলোতে মানুষের মনোবিজ্ঞান সম্পর্কে অত্যন্ত গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও জ্ঞান রয়েছে।

ইসলাম মানবজীবনের একটি পূর্ণাঙ্গ রূপরেখা প্রদান করে, যেখানে আধ্যাত্মিক, মনস্তাত্ত্বিক, আবেগীয় এবং সামাজিক দিকগুলোর সমন্বয় ঘটানো হয়েছে। ইসলামি মনোবিজ্ঞান মূলত আত্মা (রূহ) এবং এর সাথে সম্পর্কিত আচরণগত, আবেগীয় ও মানসিক প্রক্রিয়াগুলো নিয়ে কাজ করে; যেখানে দৃশ্যমান এবং অদৃশ্য–উভয় ধরনের প্রভাবকেই বিবেচনায় রাখা হয়।

এখানে আত্মাই (রূহ) হলো মূল কেন্দ্রবিন্দু; যা মানুষের আচরণ, আবেগ এবং মানসিক প্রক্রিয়াকে পরিচালিত করে। প্রতিটি মানুষের আত্মা জন্মগতভাবে 'ফিতরাত' (স্বাভাবিক প্রকৃতি) এবং একত্ববাদের সেই আদি অঙ্গীকার

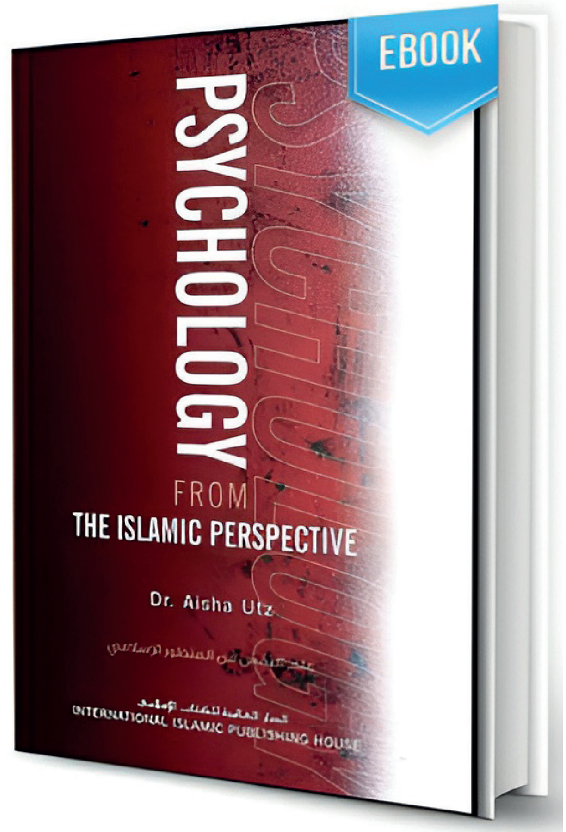

বহন করে (আল-কুরআন ৭:১৭২), ব্যক্তি পরবর্তী জীবনে যে বিশ্বাসের অধিকারীই হোক না কেন। আত্মার প্রকৃতিই হলো আধ্যাত্মিক এবং স্রষ্টার সাথে সংযোগের মাধ্যমেই এটি সজীব থাকে, ঠিক যেমন শরীরের জন্য খাদ্যের প্রয়োজন হয়। স্রষ্টার সাথে এই সম্পর্ক ছিন্ন হলে মানুষের মধ্যে উদ্বেগ, বিষণ্নতা এবং হতাশা তৈরি হয়। প্রকৃত মানসিক স্বাস্থ্য এবং প্রশান্তি অর্জিত হয় আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ (ইসলাম) এবং আত্মার পরিশুদ্ধির (তাজকিয়াহ) মাধ্যমে।

আধুনিক মনোবিজ্ঞান যেখানে মূলত দৃশ্যমান জগতের (যেমন: পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সমাজ, মিডিয়া) ওপর গুরুত্ব দেয়, সেখানে ইসলামি মনোবিজ্ঞান অদৃশ্য প্রভাবগুলোকেও (যেমন: আধ্যাত্মিক শক্তি, ঐশী নির্দেশনা) এর অন্তর্ভুক্ত করে। ওহী–প্রধানত কুরআন এবং সুন্নাহ–হলো জ্ঞানের মৌলিক উৎস, যা আত্মা এবং অদৃশ্য বাস্তবতাগুলো সম্পর্কে প্রকৃত ধারণা লাভে সাহায্য করে।

ইসলামি মনোবিজ্ঞান তাওহীদ (আল্লাহর একত্ববাদ)-এর ওপর গুরুত্ব দেয় এবং মানুষের অভ্যন্তরীণ জগত নিয়ে গবেষণা করে, যার মধ্যে রয়েছে–রূহ (আত্মা), নফস, ক্বলব (হৃদয়) এবং আকল (বুদ্ধি)। এটি মানুষের অস্তিত্বের বাহ্যিক (জাহির) এবং অভ্যন্তরীণ (বাতিন)–উভয় দিক নিয়েই আলোচনা করে। মানুষের এই অভ্যন্তরীণ বা 'বাতিন' জগতের চারটি প্রধান দিক রয়েছে : রূহ (আত্মা), নফস (প্রবৃত্তি/অহং), ক্বলব (হৃদয়) এবং আকল (বিবেক-বুদ্ধি)। ■

প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেল ও দারিদ্র্য বিমোচনে এর অসামঞ্জস্যতা

এন এস এম রেজাউর রহমান
পরিচালক, গবেষণা ও জার্নাল বিভাগ, ইসলামী ব্যাংক ট্রেনিং অ্যান্ড রিসার্চ একাডেমি (আইবিটিআরএ), ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ পিএলসি।

সারসংক্ষেপ

ইসলামী ব্যাংকিংকে বিচারব্যবস্থা, সাম্য এবং আর্থ-সামাজিক কল্যাণের ওপর ভিত্তি করে একটি আর্থিক ব্যবস্থা হিসেবে কল্পনা করা হয়েছিল, যা সুদ-ভিত্তিক প্রচলিত ব্যাংকিং ব্যবস্থা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। দারিদ্র্য বিমোচনকে প্রায়শই–সরাসরি বা পরোক্ষভাবে–এর নৈতিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে একটি হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

তবে কয়েক দশকের চর্চার পর দেখা গেছে যে, প্রচলিত প্রভাবশালী ইসলামী ব্যাংক মডেলটি দারিদ্র্য নিরসনে সীমিত কার্যকারিতা প্রদর্শন করেছে। এই প্রবন্ধটি যুক্তি তুলে ধরেছে যে, প্রথাগত ইসলামী ব্যাংকিং মডেল এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে যে অসামঞ্জস্যতা রয়েছে, তা তাত্ত্বিক বা ধর্মতাত্ত্বিক নয়

বরং কাঠামোগত। এটি তিনটি প্রধান কারণ চিহ্নিত করেছে: (১) প্রথাগত মডেলটির কেবল ব্যবসা-কেন্দ্রিক প্রকৃতি, (২) মুরাবাহা ও ইজারার মতো বাণিজ্যিক অর্থায়ন পদ্ধতির আধিপত্য এবং (৩) ইসলামী সামাজিক অর্থায়নকে ইসলামী বাণিজ্যিক ব্যাংকিং থেকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আলাদা রাখা। প্রবন্ধটি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মুনাফামুখী ব্যাংকিংয়ের সাথে পুনর্বণ্টনমূলক ইসলামী সামাজিক অর্থায়নের সমন্বিত কোনো রূপরেখা ছাড়া প্রচলিত ইসলামী ব্যাংকিং কাঠামোর মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন অর্জন করা সম্ভব নয়।

মূল শব্দসমূহ : ইসলামী ব্যাংকিং, দারিদ্র্য বিমোচন, মুরাবাহা, ইজারা, ইসলামী সামাজিক অর্থায়ন, জাকাত, উন্নয়ন অর্থায়ন।

ভূমিকা

ইসলামে রিবা (সুদ) নিষিদ্ধকরণের প্রাতিষ্ঠানিক সমাধান হিসেবে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ইসলামী ব্যাংকিংয়ের উদ্ভব ঘটে। কেবলমাত্র আইনি বাধ্যবাধকতা মানার ঊর্ধ্বে, ইসলামী অর্থব্যবস্থার সাহিত্যগুলোতে প্রায়শই উচ্চতর উদ্দেশ্যসমূহ (মাকাসিদ আল-শরীয়াহ)–যেমন: ন্যায়বিচার ('আদল'), জনকল্যাণ ('মাসলাহাহ') এবং সম্পদের সুষম বণ্টনের ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলো স্বাভাবিকভাবেই দারিদ্র্য বিমোচন এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তির প্রতি দায়বদ্ধতাকে নির্দেশ করে।

বিশ্বব্যাপী দ্রুত প্রবৃদ্ধি হওয়া সত্ত্বেও, অভিজ্ঞতালব্ধ পর্যবেক্ষণ থেকে বোঝা যায় যে ইসলামী ব্যাংকিং মূলত প্রচলিত বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের কাঠামো এবং আচরণকেই অনুসরণ করেছে, যেখানে পরিবর্তনগুলো কেবল চুক্তির ধরণগুলোর মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইসলামী ব্যাংকগুলো শরীয়াহ-সম্মত আর্থিক সেবা প্রদানে সফল হলেও, সরাসরি দারিদ্র্য বিমোচনে তাদের অবদান এখনো সামান্য। এই প্রবন্ধটি গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা করে দেখেছে যে বর্তমানে চর্চিত প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেলটি তাত্ত্বিকভাবে এবং ব্যবহারিকভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সামঞ্জস্য কি না। এখানে প্রধানত এই যুক্তিটি তুলে ধরা হয়েছে যে–প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেলটি এর বাণিজ্যিক দৃষ্টিভঙ্গি, ঋণের মতো দেখতে বাণিজ্য-ভিত্তিক চুক্তির ওপর অতি-নির্ভরশীলতা এবং এর মূল কার্যক্রমে ইসলামী সামাজিক অর্থায়নের মাধ্যমগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করতে ব্যর্থ হওয়ার কারণে দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে সহজাতভাবেই অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেলের ব্যবসা-কেন্দ্রিক প্রকৃতি

প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেলটি মূলত একটি বাণিজ্যিক ব্যাংকিং মডেল, যা শরীয়াহ-সম্মত আইনি কাঠামোর মধ্যে পরিচালিত হয়। এর প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলোর মধ্যে রয়েছে মুনাফা অর্জন, ব্যালেন্স-শিট বা স্থিতিপত্রের প্রবৃদ্ধি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং আমানতকারীদের তহবিলের সুরক্ষা। কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক আরোপিত মূলধন পর্যাপ্ততা, তারল্য কাভারেজ, সম্পদের শ্রেণিকরণ এবং প্রভিশনিং বা সঞ্চিতি রাখার নিয়মের মতো রেগুলেটরি বা নিয়ন্ত্রণমূলক বাধ্যবাধকতাগুলো এই উদ্দেশ্যগুলোকে আরো শক্তিশালী করে।

বাস্তবে, বাজারের অংশীদারিত্ব এবং মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলো সরাসরি প্রচলিত ব্যাংকগুলোর সাথে প্রতিযোগিতা করে। এর ফলে, তারা কম ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিশ্চিত মুনাফা পাওয়া যায় এমন কর্মকাণ্ডকে অগ্রাধিকার দেয়। অন্যদিকে, দারিদ্র্য বিমোচন সহজাতভাবেই একটি উচ্চ-ঝুঁকি এবং স্বল্প-মুনাফার কাজ, যার জন্য দীর্ঘমেয়াদী প্রতিশ্রুতি, নমনীয় কিস্তি বা পরিশোধের কাঠামো এবং অনিশ্চয়তা সহ্য করার ক্ষমতা প্রয়োজন। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সাধারণত কোনো জামানত, স্থিতিশীল আয় এবং ঋণের ইতিহাস থাকে না, যা বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে তাদেরকে আকর্ষণহীন গ্রাহকে পরিণত করে। ফলে, ইসলামী ব্যাংকগুলো কাঠামোগতভাবে শরীয়াহর বিধানগুলো মেনে চললেও, তাদের কার্যক্রম পরিচালনার মূল দর্শন মুনাফা বৃদ্ধির লক্ষ্যেই স্থির থাকে। এটি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পরিবর্তে মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত গ্রাহকদের সেবা প্রদানের প্রতি একটি কাঠামোগত পক্ষপাত তৈরি করে।

মুরাবাহা এবং ইজারা অর্থায়ন পদ্ধতির আধিপত্য

প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেলের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো মুরাবাহা ও ইজারা চুক্তির ব্যাপক আধিপত্য। বিভিন্ন গবেষণায় নিয়মিতভাবে দেখা গেছে যে, বিশ্বজুড়ে ইসলামী ব্যাংকগুলোর মোট অর্থায়নের প্রায় ৭০ থেকে ৯০ শতাংশই এই দু'টি পদ্ধতিতে সম্পন্ন হয়।

দারিদ্র্য বিমোচনে মুরাবাহা এবং এর সীমাবদ্ধতা

মুরাবাহা হলো একটি 'কস্ট-প্লাস' বিক্রয় চুক্তি, যেখানে ব্যাংক একটি সম্পদ ক্রয় করে এবং একটি নির্দিষ্ট মুনাফা যোগ করে গ্রাহকের কাছে পুনরায় বিক্রি করে, যা সাধারণত বিলম্বে বা কিস্তিতে পরিশোধ করতে হয়। যদিও এটি শরীয়াহ-সম্মত, তবে অর্থনৈতিক প্রভাবের দিক থেকে মুরাবাহা অনেকটা প্রচলিত ঋণ অর্থায়নের মতোই।

মুরাবাহা অর্থায়নের জন্য গ্রাহকের ক্রয়ক্ষমতা, কিস্তি পরিশোধের সামর্থ্য এবং একটি নির্দিষ্ট পর্যায়ের আর্থিক স্থিতিশীলতা থাকা প্রয়োজন। এর নির্দিষ্ট কিস্তি পরিশোধের বাধ্যবাধকতা আয়ের হ্রাস-বৃদ্ধির সাথে সমন্বয় করা যায় না, যা দারিদ্র্যসীমার নিচে বা আশেপাশে বসবাসকারী পরিবারগুলোর জন্য অনুপযুক্ত। দরিদ্রদের ক্ষমতায়নের পরিবর্তে, মুরাবাহা মূলত অর্থনৈতিকভাবে সক্রিয় এবং তুলনামূলকভাবে সচ্ছল গ্রাহকদের ব্যবসা ও ভোগান্তির ক্ষেত্রে সহায়তা করে।

ইজারা এবং এর কাঠামোগত সীমাবদ্ধতা

ইজারা বা লিজ হলো এমন একটি পদ্ধতি যেখানে নির্দিষ্ট ভাড়ার বিনিময়ে কোনো সম্পদের ব্যবহারের অধিকার গ্রাহককে দেওয়া হয়। সম্পদ অর্থায়নের ক্ষেত্রে এটি কার্যকর হলেও, ইজারা পদ্ধতির কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে; যেমন–সম্পদের মালিকানা নিশ্চিত করা, বিমা (ইন্স্যুরেন্স) এবং সম্পদ পুনরায় দখলে নেয়ার অধিকার। এই শর্তগুলো মূলত বড় ব্যবসায়ী, আইনগতভাবে সক্ষম এবং স্থিতিশীল আয়ের গ্রাহকদের বেশি সুবিধা দেয়। দরিদ্র মানুষের জন্য এই নির্দিষ্ট হারে ভাড়া পরিশোধের বাধ্যবাধকতা তাদের ঝুঁকি কমানোর বদলে উল্টো বাড়িয়ে দিতে পারে। ফলে, ইজারা অর্থায়ন মূলত বড় করপোরেট প্রতিষ্ঠান এবং বিত্তবানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে, যা দারিদ্র্য বিমোচনে খুব সামান্যই ভূমিকা রাখে।

ইসলামী সামাজিক অর্থায়নের সাথে সমন্বয়ের অভাব

ইসলামী অর্থনৈতিক তত্ত্বে সামাজিক অর্থায়নের একগুচ্ছ পূর্ণাঙ্গ মাধ্যম রয়েছে, যা মূলত দারিদ্র্য ও বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যেই বিশেষভাবে তৈরি। এগুলোর মধ্যে রয়েছে জাকাত, সাদাকাহ, ওয়াকফ এবং করজে হাসানা। সামগ্রিকভাবে, এই মাধ্যমগুলো সম্পদ পুনবণ্টন, ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়া এবং সামাজিক সংহতি বজায় রাখার কাজ করে।

তবে প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেলে, ইসলামী সামাজিক অর্থায়নের মাধ্যমগুলো প্রাতিষ্ঠানিক দিক থেকে অবহেলিত বা প্রান্তিক পর্যায়েই রয়ে গেছে। জাকাতকে এখানে একটি কৌশলগত উন্নয়ন হাতিয়ার হিসেবে দেখার পরিবর্তে কেবল একটি আইনি বাধ্যবাধকতা বা করপোরেট সামাজিক দায়বদ্ধতা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। ওয়াকফ প্রতিষ্ঠানগুলো ব্যাংক থেকে সম্পূর্ণ আলাদাভাবে কাজ করে এবং 'করজে হাসানা' বা সুদমুক্ত ঋণ সুবিধা এখানে অত্যন্ত সামান্য এবং নামমাত্র পর্যায়ে বিদ্যমান।

এই সমন্বয়ের অভাবের অর্থ হলো–ইসলামী ব্যাংকগুলো সামাজিক অর্থায়নকে কাজে লাগিয়ে দরিদ্রদের জন্য বাণিজ্যিক বিনিয়োগের ঝুঁকি কমায় না, মুনাফায় ভর্তুকি দেয় না কিংবা লোকসানও বহন করে না। এই বিচ্ছিন্নতা ইসলামী অর্থনীতির সামগ্রিক রূপকল্পকে ব্যাহত করে, যেখানে বাণিজ্যিক এবং সামাজিক অর্থায়ন একে অপরের পরিপূরক হিসেবে কাজ করার কথা।

নিয়ন্ত্রণমূলক এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সীমাবদ্ধতা

ইসলামী ব্যাংকগুলো এমন সব নিয়ন্ত্রণমূলক নিয়মনীতির অধীনে পরিচালিত হয়, যা মূলত প্রচলিত (সুদভিত্তিক) ব্যাংকিংয়ের জন্য তৈরি। এই নীতিমালাগুলো সম্পদের গুণমান, আয়ের নিশ্চয়তা এবং মূলধন সংরক্ষণের ওপর বিশেষ জোর দেয়। দরিদ্রদের অর্থায়ন করার ক্ষেত্রে সাধারণত ঋণের খেলাপি হওয়ার ঝুঁকি বেশি থাকে, আয়ের প্রবাহ নিয়মিত থাকে না এবং তদারকি খরচও অনেক বেশি হয়–যে বিষয়গুলো ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণমূলক সূচকগুলোর ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। মুনাফায় ভর্তুকি দেওয়া বা মিশ্র অর্থায়ন মডেলগুলোর প্রতি নীতিমালার স্বীকৃতি না থাকায়, দারিদ্র্য বিমোচনমূলক উদ্যোগে অংশ নেয়ার ক্ষেত্রে ইসলামী ব্যাংকগুলোর আগ্রহ খুব সীমিত থাকে। এর ফলে, ভালো উদ্দেশ্য নিয়ে নেওয়া উদ্যোগগুলোও শেষ পর্যন্ত অত্যন্ত ক্ষুদ্র পরিসরে এবং মূলধারার বাইরে থেকে যায়।

ধারণাগত অমিল : বাণিজ্যিক ব্যাংকিং বনাম উন্নয়ন অর্থায়ন

মূলত, প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেল এবং দারিদ্র্য বিমোচনের মধ্যে এই অসামঞ্জস্যতা একটি ধারণাগত অমিলকে প্রতিফলিত করে। বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো–তা ইসলামী হোক বা অন্য কোনো ঘরানার–দারিদ্র্য বিমোচনকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করার জন্য তৈরি করা হয়নি। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য প্রয়োজন উন্নয়নমূলক অর্থায়ন, অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি এবং প্রভাব-কেন্দ্রিক কর্মক্ষমতা যাচাইয়ের মাপকাঠি।

কাঠামোগত পরিবর্তন ছাড়া একটি মুনাফামুখী ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে বড় পরিসরে দারিদ্র্য বিমোচন আশা করা অবাস্তব। ইসলামী ব্যাংকিং তার প্রচলিত রূপে পরোক্ষভাবে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহায়তা করতে পারে, কিন্তু এটি দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য নির্দিষ্ট বা বিশেষায়িত আর্থিক ব্যবস্থার বিকল্প হতে পারে না।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে যুক্তি দেখানো হয়েছে যে, প্রথাগত ইসলামী ব্যাংক মডেলটি কাঠামোগতভাবে দারিদ্র্য বিমোচনের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ। এই অমিল তৈরি হয়েছে এর ব্যবসা-কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি, মুরাবাহা ও ইজারা অর্থায়নের ওপর নির্ভরশীলতা এবং ইসলামী সামাজিক অর্থায়নের মাধ্যমগুলো থেকে এর প্রাতিষ্ঠানিক বিচ্ছিন্নতার কারণে। এই সীমাবদ্ধতাগুলো ইসলামী আইন বা নৈতিকতার মধ্যে নিহিত নয়, বরং আধুনিক আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে যেভাবে ইসলামী ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে, তার মধ্যেই বিদ্যমান।

ইসলামী অর্থায়নকে দারিদ্র্য বিমোচনে অর্থবহ অবদান রাখতে হলে একটি আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন–এমন একটি ব্যবস্থা যা মুনাফায় ভর্তুকি, ঝুঁকি ভাগ করে নেওয়া এবং উন্নয়নমুখী কাঠামোর মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকিংয়ের সাথে ইসলামী সামাজিক অর্থায়নকে একীভূত করবে। এই ধরনের সংস্কার ছাড়া, দারিদ্র্য বিমোচন প্রথাগত ইসলামী ব্যাংকিং অনুশীলনের একটি পরিমাপযোগ্য ফলাফল হওয়ার পরিবর্তে কেবল একটি উচ্চাকাঙ্ক্ষী আদর্শ হিসেবেই থেকে যাবে। ■

আধুনিক বিশ্বে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা

প্রকৌশলী মোহসিউ মিনহাজ নিলয়
শিক্ষক, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ঢাকা

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির অভাবনীয় সব উদ্ভাবনের হাত ধরে আধুনিক বিশ্ব এক অতুলনীয় গতিতে এগিয়ে চলেছে। একসময় যেসব আবিষ্কার কেবল বিজ্ঞান কল্পকাহিনীর পাতায় সীমাবদ্ধ ছিল, আজ সেগুলো আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অংশ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কম্পিউটার, রোবট এবং বুদ্ধিমান যন্ত্রগুলো এখন এমন সব কাজ করতে সক্ষম হচ্ছে যা মানুষের চিন্তা, শেখা এবং সিদ্ধান্ত নেয়ার ক্ষমতাকে অনুকরণ করে। এটি একটি মৌলিক প্রশ্ন জাগিয়ে তোলে: যন্ত্রের পক্ষে মানুষের মস্তিষ্কের মতো আচরণ করা কীভাবে সম্ভব? এর উত্তর লুকিয়ে আছে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স (এআই)-এর মধ্যে। বিজ্ঞান ও প্রকৌশলবিদ্যার অভাবনীয় উন্নতি এআই-এর মাধ্যমেই এই অসাধ্যকে সাধন করেছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আধুনিক যুগের অন্যতম উল্লেখযোগ্য ও প্রভাবশালী প্রযুক্তি। ১৯৫৬ সালে জন ম্যাককার্থি প্রথম ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই)’ শব্দটি উদ্ভাবন করেন। তার মতে, এটি হলো ‘বুদ্ধিমান যন্ত্র, বিশেষ করে মেধাবী কম্পিউটার প্রোগ্রাম তৈরির বিজ্ঞান ও প্রকৌশল’ (ম্যাককার্থি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা কী? ১৯৯৮)। কম্পিউটেশনাল সিস্টেম বা গাণিতিক পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের বুদ্ধিমত্তার বিভিন্ন দিক বোঝা এবং সেগুলোর প্রতিফলন ঘটানোর প্রচেষ্টার সাথে এআই গভীরভাবে জড়িত।

ফিনলে এবং ডিক্স (১৯৯৬) এর মতে, ইন্টেলিজেন্ট এজেন্ট বা বুদ্ধিমান এজেন্ট হলো এমন সিস্টেম যা পরিকল্পনা করতে পারে, পরিবর্তনশীল পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে পারে, অভিজ্ঞতা থেকে শিখতে পারে, চারপাশের পরিবেশের সাথে মিথস্ক্রিয়া করতে পারে এবং এমনকি সৃজনশীলতা বা সমস্যা সমাধানের দক্ষতাও প্রদর্শন করতে পারে।

বর্তমানে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) আর কোনো সুদূরপ্রসারী ধারণা নয়। এটি একুশ শতকের অন্যতম প্রধান প্রযুক্তিতে পরিণত হয়েছে, যার প্রয়োগ এখন বিভিন্ন শিল্পখাতে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ধরন

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাকে সাধারণত দু'টি মৌলিক শ্রেণিতে ভাগ করা হয়: দুর্বল এআই (আর্টিফিশিয়াল ন্যারো ইন্টেলিজেন্স; এএনআই) এবং শক্তিশালী এআই (আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স, এজিআই)।

দুর্বল এআই (এএনআই)

দুর্বল এআই একটি নির্দিষ্ট সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কাজগুলো দক্ষতার সাথে সম্পন্ন করার জন্য তৈরি করা হয়েছে। এই সিস্টেমগুলোর কোনো চেতনা বা প্রকৃত বিচারবুদ্ধি নেই; এর পরিবর্তে, এগুলো অ্যালগরিদম, ডেটা এবং পূর্বনির্ধারিত লক্ষ্যের ওপর নির্ভর করে কাজ করে। সিরি (Siri) বা অ্যালেক্সা (Alexa)-র মতো টুলগুলোর দিকে তাকালে মনে হতে পারে যে তারা চিন্তা করছে, কিন্তু আসলে তারা তা করছে না। এগুলো, নেটফ্লিক্স আপনাকে স্ক্রিনে ধরে রাখার জন্য যে অ্যালগরিদম ব্যবহার করে কিংবা আপনার ব্যাংকের জালিয়াতি শনাক্তকরণের সতর্কতা–সবই 'ন্যারো এআই' বা সংকীর্ণ বুদ্ধিমত্তার চমৎকার উদাহরণ। এগুলো কেবল তাদের নির্ধারিত গণ্ডির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

আমাদের মনে হতে পারে যে সাম্প্রতিক কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) অভাবনীয় সাফল্য সবকিছু বদলে দিয়েছে, কিন্তু এর পেছনের মূল মেকানিজম বা কার্যপদ্ধতি মূলত একই রয়ে গেছে। একটি চ্যাটবট যখন কোনো চিত্রনাট্য লেখে কিংবা একটি গাড়ি যখন মোড় পার হয়, তখন তারা মূলত সুনির্দিষ্ট কিছু গণিত-নির্ভর নির্দেশেরই প্রতিফলন ঘটায়। আইবিএম ওয়াটসন-এর কথা চিন্তা করুন: এটি রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে একজন প্রতিভাবান বিশেষজ্ঞের মতো কাজ করলেও, সেই নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের বাইরে এর কোনো কাণ্ডজ্ঞান বা সাধারণ বুদ্ধি নেই। এটি একটি অত্যন্ত মেধাবী হাতুড়ির মতো, কিন্তু তবুও এটি কেবল একটি হাতুড়িই যা শুধুমাত্র একটি এবং একটি নির্দিষ্ট কাজের জন্যই তৈরি করা হয়েছে।

শক্তিশালী এআই (আর্টিফিশিয়াল জেনারেল ইন্টেলিজেন্স; এজিআই)

শক্তিশালী এআই একটি যন্ত্র হিসেবে মানুষের মস্তিষ্ক যা যা করতে পারে, তার সবই করতে সক্ষম। এটি কেবল কোড বা নির্দেশনা অনুসরণ করবে না; বরং এর নিজস্ব চিন্তা করার এবং শেখার স্বাধীনতা থাকবে। তবে বাস্তবিকভাবে আমরা এখনও সেই পর্যায় থেকে অনেক দূরে আছি। এটি এখনো কাগজে-কলমে থাকা একটি ধারণা মাত্র। এমনকি বর্তমানে আমাদের কাছে থাকা সবথেকে বুদ্ধিমান কম্পিউটারগুলোও মূলত বুদ্ধিমত্তার অভিনয় করছে; তারা আসলে জানেই না যে তারা কে, এবং তারা এক ধরনের সমস্যা থেকে অন্য ধরনের সমস্যায় সরাসরি ঝাঁপ দিতে পারে না।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ঐতিহাসিক বিকাশ

বুদ্ধিমান যন্ত্র তৈরির ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই মানুষকে মুগ্ধ করে আসছে। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) আনুষ্ঠানিক বিকাশ শুরু হয় বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে, যা ডিজিটাল কম্পিউটিংয়ের উত্থানের সাথে সরাসরি মিলে যায়।

১৯৫০ সালের দিকে ব্রিটিশ গণিতবিদ অ্যালান টুরিং এমন একটি প্রশ্ন করেছিলেন যা সবকিছু বদলে দিয়েছিল: "যন্ত্র কি চিন্তা করতে পারে?" তার "কম্পিউটিং মেশিনারি অ্যান্ড ইন্টেলিজেন্স" প্রবন্ধে তিনি 'টুরিং টেস্ট'-এর ধারণা তুলে ধরেন, যার উদ্দেশ্য ছিল একটি কম্পিউটার একজন প্রকৃত মানুষকে বোকা বানানোর মতো যথেষ্ট মানবিক আচরণ করতে পারে কি না তা নির্ধারণ করা।

কিন্তু ১৯৫৬ সালের ডার্টমাউথ কনফারেন্সের আগে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা এআই আনুষ্ঠানিকভাবে এই নামটি পায়নি। সেখানেই অ্যালেন নেওয়েল, হার্বার্ট এ. সাইমন এবং জে.সি. শ-এর মতো গবেষকরা 'লজিক থিওমিস্ট' প্রদর্শন করেছিলেন, যাকে অধিকাংশ মানুষ প্রথম এআই প্রোগ্রাম হিসেবে গণ্য করেন। ৬০-এর দশকেও এর অগ্রগতি অব্যাহত ছিল; ১৯৬৭ সালে ফ্রাঙ্ক রোজেনব্ল্যাট প্রাথমিক পর্যায়ের মেশিন লার্নিং পরীক্ষার জন্য 'মার্ক ১ পারসেপট্রন' (Mark I Perceptron) তৈরি করেন। তবে সাফল্যের পথ টি মোটেও মসৃণ ছিল না। এই ক্ষেত্রটি চরম উত্তেজনা বা হাইপের মধ্য দিয়ে যেমন গেছে, তেমনি এর পরে এসেছে 'এআই উইন্টার' বা স্থবিরতার সময়, যখন গবেষণা অনুদান এবং আগ্রহ উভয়ই শুকিয়ে গিয়েছিল।

পরিশেষে, পরিস্থিতি স্থিতিশীল হয়ে আসে। ৮০-এর দশকের মধ্যে নিউরাল নেটওয়ার্ক এবং ব্যাকপ্রোপ্যাগেশন (backpropagation) আবারো জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। বর্তমান সময়ে দ্রুত এগিয়ে আসলে দেখা যায়, আমাদের কাছে থাকা বিশাল পরিমাণ ডেটা এবং অত্যন্ত শক্তিশালী কম্পিউটার এই প্রযুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এখন এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা আমাদের হাসপাতাল ও ব্যাংক

থেকে শুরু করে আমাদের চালানো গাড়ি এবং দেখা সিনেমা–সবখানেই বিদ্যমান। একুশ শতকে বিশাল ডেটাসেট ("বিগ ডেটা") এর সহজলভ্যতা, বর্ধিত কম্পিউটিং ক্ষমতা এবং অ্যালগরিদমের উন্নতি এআই-এর ব্যাপক প্রসারে ভূমিকা রেখেছে। বর্তমানে স্বাস্থ্যসেবা, অর্থসংস্থান, পরিবহন, শিক্ষা, বিনোদন এবং সাইবার নিরাপত্তার মতো বিভিন্ন শিল্পখাতে এআই এক অবিচ্ছেদ্য ভূমিকা পালন করছে।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) এখন মানুষের জীবনের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করছে। এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য প্রয়োগগুলোর মধ্যে রয়েছে চিকিৎসা এবং স্বাস্থ্যসেবা খাত।

এআই প্রযুক্তি চিকিৎসকদের মেডিক্যাল ইমেজ বা ছবি বিশ্লেষণ, রোগ পূর্বাভাস, চিকিৎসার পরিকল্পনা এবং প্রশাসনিক কাজে সহায়তা করে। জেনারেটিভ এআই মডেলগুলো, যেমন জিপিটি (GPT) ভেরিয়েন্ট বা সংস্করণসমূহ, রোগীর নথিপত্রের সারসংক্ষেপ তৈরি করতে এবং চিকিৎসাবিষয়ক প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানে সহায়তা করে; অন্যদিকে, রোবোটিক্স হাসপাতালের লজিস্টিক বা মালামাল আনা-নেয়ার কাজে সহায়তা করে। কোভিড-১৯ মহামারীর সময় হাসপাতালে খাবার, ওষুধ এবং চিকিৎসা সরঞ্জাম পৌঁছে দেয়ার জন্য এআই-চালিত রোবট ব্যবহার করা হয়েছিল, যা মানুষের সংক্রমণের ঝুঁকি কমিয়ে দিয়েছিল।

যোগাযোগ এবং সামাজিক মিথস্ক্রিয়া

ভিডিও কনফারেন্সিং প্ল্যাটফর্ম, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং পেশাদার গবেষণা প্ল্যাটফর্মসহ বিভিন্ন যোগাযোগ মাধ্যমকে এআই (এআই) আরো উন্নত করে তুলছে। এটি মূলত উন্নতমানের সুপারিশ (recommendations), অনুবাদ, কন্টেন্ট মডারেশন বা বিষয়বস্তু নিয়ন্ত্রণ, কণ্ঠস্বর-চালিত সিস্টেম এবং ব্যবহারকারীর অভিজ্ঞতা বৃদ্ধির মাধ্যমে এই কাজগুলো করে থাকে।

পরিবহন এবং স্বয়ংক্রিয়তা

স্বয়ংক্রিয়ভাবে গাড়ি চালানো, ট্রাফিক ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং বিমানের অটো-পাইলট সিস্টেমে এআই এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এআই-চালিত নেভিগেশন, সেন্সর ফিউশন এবং প্রেডিক্টিভ অ্যানালিটিক্স বা আগাম বিশ্লেষণ রাস্তার নিরাপত্তা এবং লজিস্টিকস বা পণ্য পরিবহনের দক্ষতা বৃদ্ধি করে।

ইমেজ এবং ফেসিয়াল রিকগনিশন (ছবি ও মুখমণ্ডল শনাক্তকরণ): বায়োমেট্রিক শনাক্তকরণ, নিরাপত্তা ব্যবস্থা, মেডিক্যাল ইমেজ বিশ্লেষণ, মোবাইল ব্যাংকিং অ্যাপ্লিকেশন এবং নজরদারির কাজে এআই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

রোবোটিক্স এবং অটোমেশন: এআই-চালিত রোবটগুলো উৎপাদন শিল্প, মহাকাশ অভিযান, গভীর সমুদ্র গবেষণা এবং গৃহস্থালির কাজ যেমন–ভ্যাকুয়াম ক্লিনিং, ঘাস কাটা এবং পুল রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

সাইবার নিরাপত্তা এবং ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

মেশিন লার্নিং মডেলগুলো অস্বাভাবিকতা শনাক্ত করতে, সাইবার হুমকির পূর্বাভাস দিতে এবং ক্রমাগত পরিবর্তনশীল ডিজিটাল আক্রমণের বিরুদ্ধে সিস্টেমের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা শক্তিশালী করতে সহায়তা করে।

রাইড-শেয়ারিং এবং লজিস্টিকস: উবার এবং লিফট-এর মতো কোম্পানিগুলো চালকদের সাথে যাত্রীদের মিলিয়ে দিতে, পৌঁছানোর আনুমানিক সময় নির্ধারণ করতে, রুট বা পথ অপ্টিমাইজ করতে এবং যানজট কমাতে এআই (এআই) ব্যবহার করে।

ব্যবসায়িক কার্যক্রম

কাস্টমার সার্ভিস চ্যাটবট থেকে শুরু করে বুদ্ধিমান পূর্বাভাস ব্যবস্থা পর্যন্ত, এআই কর্মদক্ষতা বৃদ্ধি, খরচ সাশ্রয় এবং দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়তা করে। যেসব কোম্পানি এআই ব্যবহার করে, তারা সাধারণত উৎপাদনশীলতা এবং গ্রাহক সন্তুষ্টির ক্ষেত্রে লক্ষণীয় উন্নতি অনুভব করে।

চ্যালেঞ্জ এবং নৈতিক উদ্বেগসমূহ

অসংখ্য সুবিধা থাকা সত্ত্বেও, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা (এআই) বেশ কিছু বড় ধরনের চ্যালেঞ্জ বা প্রতিকূলতাও তৈরি করে। এর মধ্যে একটি প্রধান সমস্যা হলো কর্মসংস্থানচ্যুতি বা চাকরি হারানো; যেহেতু প্রযুক্তি এবং কগনিটিভ (চিন্তন-ভিত্তিক) প্রযুক্তিগুলো কিছু ক্ষেত্রে মানুষের শ্রমের বিকল্প হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এছাড়া ডেটা প্রাইভেসি বা তথ্যের গোপনীয়তা, অ্যালগরিদমিক বায়াস (পক্ষপাতিত্ব), নজরদারি এবং দায়বদ্ধতা সংক্রান্ত নৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোও এখন বৈশ্বিক উদ্বেগের বিষয়ে পরিণত হয়েছে।

উপসংহার

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা একটি তাত্ত্বিক ধারণা থেকে বিবর্তিত হয়ে বিশ্ব অর্থনীতি, সভ্যতা এবং দৈনন্দিন জীবনকে প্রভাবিত করার মতো একটি বৈপ্লবিক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। বিভিন্ন খাতে এর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা একদিকে যেমন বিশাল সম্ভাবনা উন্মোচন করে, অন্যদিকে উল্লেখযোগ্য সীমাবদ্ধতাও প্রকাশ করে। এআই-এর বিকাশ অব্যাহত থাকায়, আমাদের মনোযোগ অবশ্যই দায়িত্বশীল উদ্ভাবন, নৈতিক সুরক্ষা এবং অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতিগুলোর ওপর নিবদ্ধ রাখতে হবে, যা নিশ্চিত করবে যে এই প্রযুক্তি মানুষের কল্যাণে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। ■

ইস্তাম্বুলঃ ইতিহাস, সভ্যতা ও ধর্মীয়-আধ্যাত্মিকতার এক অনন্য নগরী

মোঃ সালাহউদ্দিন, পিএইচডি
দক্ষিণ এশিয়ার রাজনীতি ও ধর্মবিশ্লেষক,
মিরাত হাবের, তুর্কি

১৪৫৩ সালের ২৯ মে-ইসলামের ইতিহাসে এক অনন্য মাহেন্দ্রক্ষণ। এই দিনটি কেবল একটি বিজয়ের স্মারক নয়; বরং এটি মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভবিষ্যদ্বাণির পূর্ণতা। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মুসলিম উম্মাহর হৃদয়ে অনুপ্রেরণার প্রতীক হয়ে থাকা সেই ভবিষ্যদ্বাণি-যে একদিন কনস্টান্টিনোপল বিজিত হবে-এই দিন বাস্তব রূপ লাভ করে। এ বিজয় শুধু একটি নগরের পতন নয়; বরং এটি ছিল একটি আদর্শ, একটি বিশ্বাস এবং একটি সভ্যতার গৌরবময় উত্থান।

ইস্তাম্বুল শুধুমাত্র একটি শহরের নাম নয়; এটি এক জীবন্ত ইতিহাস, বহুমাত্রিক সভ্যতার আলোকস্তম্ভ এবং এক অনন্য ভূ-রাজনৈতিক সেতুবন্ধন। ২৬০০ বছরেরও অধিক পুরোনো এই নগরী বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এটি এমন একটি বিরল শহর, যা একাধারে তিনটি বিশ্বসেরা সাম্রাজ্যের-রোমান, বাইজেন্টাইন এবং

উসমানীয়-রাজধানী হিসেবে ইতিহাসকে প্রভাবিত করেছে।

এই নগরী একসময় ছিল হেলেনিস্টিক গ্রিকদের জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র, পরবর্তীতে রোমানদের সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র, এরপর বাইজেন্টাইন খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক হৃদয়স্থল। সর্বশেষে উসমানীয় শাসনে ইস্তাম্বুল পরিণত হয় একটি বিস্তৃত ইসলামী সভ্যতার কেন্দ্রবিন্দুতে-যেখানে গড়ে ওঠে অসংখ্য মসজিদ, মাদ্রাসা, পাঠাগার ও জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান।

বসফরাস প্রণালী, মারমারা সাগর ও গোল্ডেন হর্নের সংযোগস্থলে অবস্থিত এই শহর প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্য, সামরিক কৌশল এবং সাংস্কৃতিক বিনিময়ের কেন্দ্রবিন্দু। পূর্ব ও পশ্চিমের মিলনস্থল হিসেবে ইস্তাম্বুল এক অনন্য ভূ-রাজনৈতিক সেতুবন্ধন তৈরি করেছে। ফলে এটি শুধু ঐতিহাসিক নয়, বরং রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মহিমারও অনন্য নিদর্শন।

এই প্রবন্ধে ইস্তাম্বুলের ইতিহাস ও তাৎপর্যকে তিনটি প্রধান পর্যায়ে বিশ্লেষণ করা হয়েছে-প্রথমত, বাইজেন্টিয়াম থেকে কনস্টান্টিনোপল পর্যন্ত নগরটির ক্রমবিকাশ ও সাংস্কৃতিক ভিত্তি; দ্বিতীয়ত, ১৪৫৩ সালের ২৯ মে উসমানীয় সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহের নেতৃত্বে কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের তাৎপর্য ও সভ্যতাগত রূপান্তর; এবং তৃতীয়ত, আধুনিক তুরস্কে ইস্তাম্বুলের উন্নয়ন, বৈশ্বিক গুরুত্ব ও ভবিষ্যৎ দিকনির্দেশনা।

ঐতিহাসিক পটভূমি-বাইজেন্টাইন থেকে আধুনিক ইস্তাম্বুল

খ্রিস্টপূর্ব ৬৫৭ সালে বসফরাস প্রণালীর তীরে গ্রিক উপনিবেশকারীরা যখন বাইজেন্টিয়াম নামে একটি ছোট শহরের ভিত্তি স্থাপন করে, তখন তারা হয়তো কল্পনাও করেনি যে এই নগরী একদিন পৃথিবীর তিনটি শ্রেষ্ঠ সাম্রাজ্যের রাজধানীতে পরিণত হবে। এর অনন্য ভৌগোলিক অবস্থান-যেখানে ইউরোপ ও এশিয়া মিলিত হয়েছে-এই শহরকে সামরিক, বাণিজ্যিক ও সাংস্কৃতিকভাবে কৌশলগত কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলে।

৩৩০ খ্রিস্টাব্দে রোমান সম্রাট কনস্টান্টাইন দ্য গ্রেট এই শহরকে "নতুন রোম" হিসেবে ঘোষণা করেন, যা ইতিহাসে কনস্টান্টিনোপল নামে পরিচিত হয়। এই পরিবর্তন কেবল প্রশাসনিক ছিল না; এটি ছিল ধর্মীয় ও বুদ্ধিবৃত্তিক এক বড় রূপান্তর। পশ্চিম রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর কনস্টান্টিনোপল হয়ে ওঠে পূর্ব রোমান বা বাইজেন্টাইন সাম্রাজ্যের কেন্দ্র।

এই শহর ধীরে ধীরে খ্রিস্টীয় বিশ্বের ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্বের কেন্দ্র হয়ে ওঠে। ৫৩৭ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট জাস্টিনিয়ানের নির্দেশে নির্মিত আয়া সোফিয়া কেবল একটি স্থাপনা নয়, বরং স্থাপত্য ইতিহাসের এক যুগান্তকারী নিদর্শন। প্রায় এক সহস্রাব্দ ধরে এটি বিশ্বের বৃহত্তম গির্জা হিসেবে পরিচিত ছিল।

কনস্টান্টিনোপল শুধু প্রাচীন সামরিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্রই ছিল না; এটি ছিল জ্ঞানচর্চারও কেন্দ্র। দর্শন, গণিত, চিকিৎসা ও ধর্মতত্ত্বের ক্ষেত্রে এখানকার গ্রন্থাগার ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ইউরোপীয় রেনেসাঁর ভিত্তি রচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

১৪৫৩ সালে এই কনস্টান্টিনোপলই নতুন এক ইতিহাসের সূচনা করে-ইসলামী সভ্যতার অধীনে রূপান্তরিত হয়ে ইস্তাম্বুল নাম ধারণ করে।

১৪৫৩ সালের ২৯ মে: বিজয় ও সভ্যতার নবযাত্রা

১৪৫৩ সালের ২৯ মে মাত্র ২১ বছর বয়সে সুলতান মুহাম্মদ আল-ফাতিহ ৫৩ দিনের অবরোধ শেষে কনস্টান্টিনোপল বিজয় করেন। এই বিজয় কেবল ভূখণ্ডগত অর্জন ছিল না; এটি ছিল ইসলামী সভ্যতার এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা এবং মহানবী (সা.)-এর সুপ্রসিদ্ধ ভবিষ্যদ্বাণির বাস্তবায়ন-"তোমরা অবশ্যই কনস্টান্টিনোপল বিজয় করবে; সেই আমীর কতই না উত্তম, এবং সেই বাহিনী কতই না উত্তম।"

বিজয়ের পর উসমানীয়রা শহর ধ্বংস না করে পুনর্গঠনের পথ বেছে নেয়। আয়া সোফিয়াকে মসজিদে রূপান্তর করা হলেও তার স্থাপত্য ও নান্দনিকতা অক্ষুণ্ন রাখা হয়। শহরজুড়ে গড়ে ওঠে মসজিদ, মাদ্রাসা, পাঠাগার, হাম্মাম ও

বাজার। ফাতিহ কমপ্লেক্সের মাধ্যমে ধর্ম, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজকল্যাণকে একত্রে একটি পূর্ণাঙ্গ নগর কাঠামোয় রূপ দেওয়া হয়।

উসমানীয় শাসনে ইস্তাম্বুল বহু শতাব্দী ধরে ধর্মীয় সহাবস্থান ও বহুত্ববাদের কেন্দ্র ছিল। "মিল্লেত ব্যবস্থা"-র মাধ্যমে খ্রিস্টান, ইহুদি ও অন্যান্য সম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্মীয় ও সামাজিক পরিচয় বজায় রেখে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান করত।

১৬শ শতকে সুলতান সুলেমান দ্য ম্যাগনিফিসেন্টের সময় ইস্তাম্বুল শিল্প, সাহিত্য, বিচারব্যবস্থা ও কূটনীতির বৈশ্বিক কেন্দ্রে পরিণত হয়। মিমার সিনানের স্থাপত্যে গড়ে ওঠে সুলাইমানিয়া কমপ্লেক্স–যা ইসলামী সভ্যতার এক অনন্য নিদর্শন।

১৪৫৩ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত ইস্তাম্বুল উসমানীয় খেলাফতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র ছিল, যেখানে ইসলামী জ্ঞানচর্চা ও প্রশাসনিক কাঠামো বিকশিত হয়।

এই শহরের আধ্যাত্মিক গুরুত্ব আরও গভীর হয় সাহাবি হযরত আবু আইয়ুব আল-আনসারী (রা.)-এর মাজারের উপস্থিতিতে, যা আইয়ুপ সুলতান মসজিদকে মুসলিম বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে।

আধুনিক ইস্তাম্বুল: উন্নয়ন ও বৈশ্বিক গুরুত্ব

১৯২৩ সালে তুরস্ক প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পর মোস্তফা কামাল আতাতুর্ক রাজধানী আঙ্কারায় স্থানান্তর করেন। যদিও রাজনৈতিক কেন্দ্র বদলে যায়, ইস্তাম্বুল তার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মর্যাদা হারায়নি; বরং আরও শক্তিশালী অর্থনৈতিক কেন্দ্রে পরিণত হয়।

বর্তমানে ইস্তাম্বুলে প্রায় ১.৬ কোটি মানুষ বসবাস করে, যা দেশের অর্থনীতির প্রায় এক-তৃতীয়াংশ উৎপাদন করে। পর্যটন, ব্যাংকিং ও শিল্প খাতে শহরটির আয় বৈশ্বিক পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়্যেব এরদোয়ানের আমলে শহরে ব্যাপক অবকাঠামোগত উন্নয়ন হয়েছে। চামলিজা মসজিদ, ইউরেশিয়া টানেল, মারমারায় রেল প্রকল্প এবং ইস্তাম্বুল বিমানবন্দর শহরটিকে বৈশ্বিক সংযোগের অন্যতম কেন্দ্র করে তুলেছে। আজ ইস্তাম্বুল এক অনন্য মহানগর–যেখানে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও আধুনিক প্রযুক্তি একত্রে ভবিষ্যতের নগরদর্শন নির্মাণ করছে।

উপসংহার

ইস্তাম্বুল কেবল একটি শহর নয়; এটি মানবসভ্যতার ধারাবাহিক ইতিহাসের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি। বাইজেন্টিয়াম থেকে কনস্টান্টিনোপল এবং সেখান থেকে আধুনিক ইস্তাম্বুল–এই রূপান্তর মানব ইতিহাসের এক অসাধারণ অধ্যায়।

মুসলিম বিশ্বের জন্য ইস্তাম্বুল কেবল বিজয়ের স্মারক নয়; এটি ন্যায়, প্রজ্ঞা, সহনশীলতা ও সভ্যতার আদর্শ। এরদোয়ানের ভাষায়, "ইস্তাম্বুল আমাদের প্রেম ও সভ্যতা।" ওরহান পামুকের লেখায় এটি এক নীরব আবেগ, আর টয়নবির দৃষ্টিতে–বিশ্ব এক রাষ্ট্র হলে তার রাজধানী হতো ইস্তাম্বুল।

ইস্তাম্বুল আমাদের শেখায় যে কোনো জাতির প্রকৃত শক্তি কেবল প্রযুক্তিতে নয়, বরং তার ইতিহাস, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধে নিহিত। তাই ২৯ মে কেবল বিজয়ের দিন নয়; এটি সভ্যতার ধারাবাহিকতা ও ভবিষ্যতের প্রতি এক অনন্ত অঙ্গীকার। ■

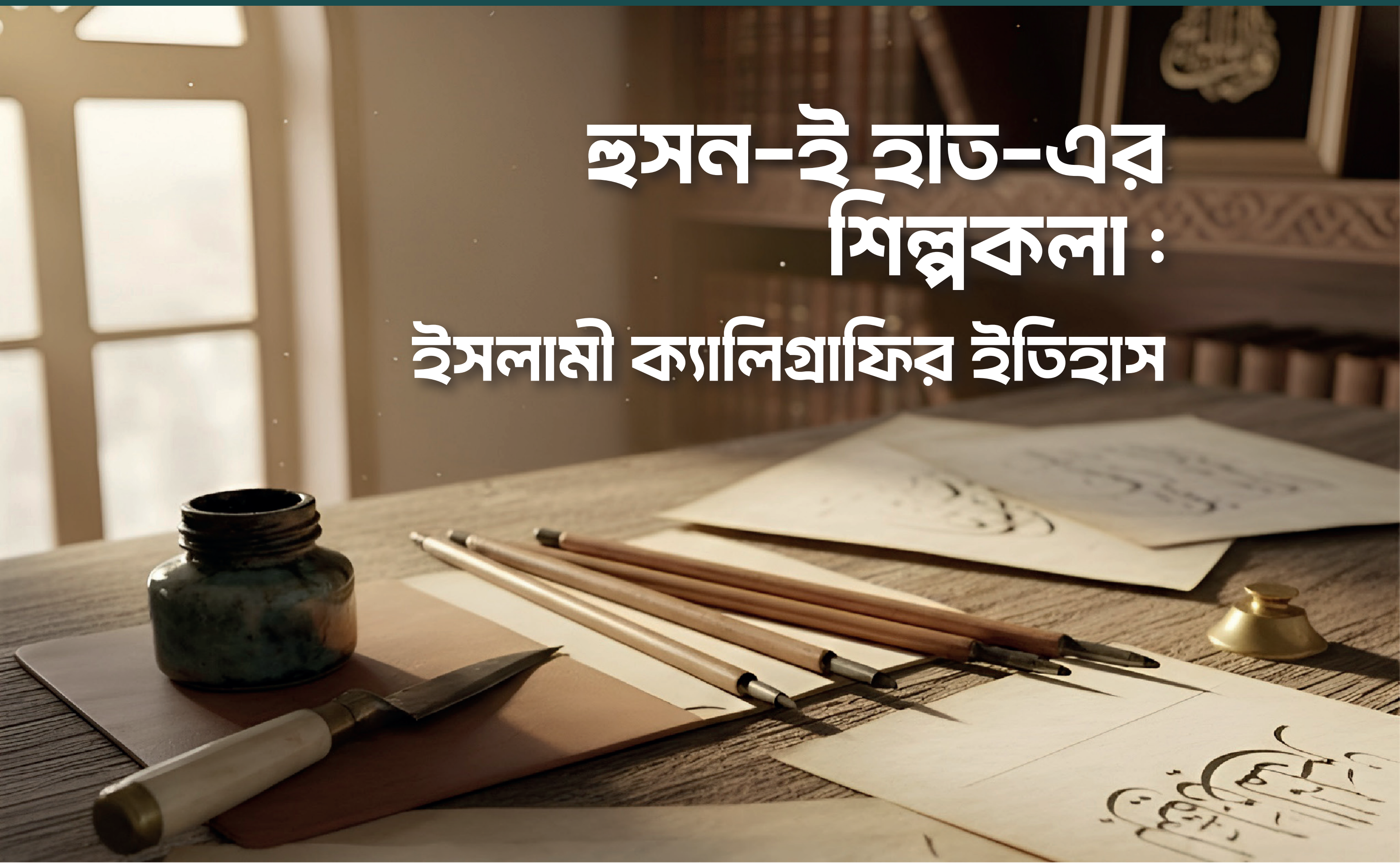

হুসন-ই হাত-এর শিল্পকলা : ইসলামী ক্যালিগ্রাফির ইতিহাস

আহমেত কুতলুহান

তুরস্কের একজন প্রখ্যাত ক্যালিগ্রাফার

আরবি ক্রিয়াপদ 'ḥaṭṭ' থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ 'লেখা', 'রেখা', 'পথ' বা 'পদ্ধতি'–এই মূল থেকে তুর্কি ভাষায় 'হাত' শব্দটি গঠিত হয়েছে। পরিভাষাগতভাবে এটি নান্দনিক নীতির ভিত্তিতে আরবি লিপিকে সুন্দরভাবে লেখার শিল্পকে বোঝায়, যা 'হুসন-ই হাত' নামে পরিচিত। ধ্রুপদী উৎসসমূহে এই শিল্পকে প্রায়ই 'শারীরিক উপকরণের মাধ্যমে প্রকাশিত এক আধ্যাত্মিক জ্যামিতি' হিসেবে বর্ণনা করা হয়। এই সংজ্ঞা সেই গভীর নান্দনিক ও আধ্যাত্মিক সংবেদনশীলতাকে যথাযথভাবে প্রকাশ করে, যার মধ্যে ক্যালিগ্রাফি শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে বিকশিত ও সমৃদ্ধ হয়েছে।

পশ্চিমা বিশ্বে হুসন-ই হাত সাধারণত 'ক্যালিগ্রাফি' নামে পরিচিত। বিশ্বকোষসমূহে ক্যালিগ্রাফিকে সংজ্ঞায়িত করা হয় 'সুন্দর লেখার শিল্প, যা নান্দনিক নিয়ম ও সুষম অনুপাত অনুসারে সম্পাদিত হয়।'

হিজরতের কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ক্যালিগ্রাফি ইসলামী বিশ্বের একটি সম্মিলিত সাংস্কৃতিক সম্পদে পরিণত হয় এবং ধীরে ধীরে ইসলামী ক্যালিগ্রাফির স্বতন্ত্র চরিত্র অর্জন করে। প্রাক-ইসলামী আরবি শিলালিপির গবেষণা থেকে জানা যায়, আরবি লিপির উৎপত্তি মূলত নাবাতীয় কার্সিভ লিপি থেকে, যা আবার ফিনিশীয় বর্ণমালার ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত।

আরবি লিখন পদ্ধতি মক্কা ও মদিনায় বিস্তৃত হলে তা বিভিন্ন নামে পরিচিত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এটি 'সেজম' নামে পরিচিত ছিল; মদিনায় এসে এটি 'মেদেনী' নামে পরিচিতি লাভ করে। পরবর্তীতে এটি দু'টি প্রধান শৈলীতে বিভক্ত হয়–'মাইল', যেখানে ডান থেকে বামে হেলানো দীর্ঘ উল্লম্ব রেখার বৈশিষ্ট্য দেখা যায়, এবং 'মেশক', যেখানে অনুভূমিক রেখার বিস্তৃতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

পরবর্তীতে যখন আলী ইবনে আবি তালিব (চতুর্থ রাশিদুন

খলিফা) কুফাকে প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন, তখন এই লিপির উল্লেখযোগ্য বিকাশ ঘটে এবং এটি 'কুফিক' নামে পরিচিত হয়। এরপর থেকে 'কুফিক' শব্দটি একটি বিস্তৃত পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হতে থাকে, যা ইসলামের প্রাথমিক যুগ থেকে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত 'মক্কি' ও 'মাদেনী' ধাঁচের পূর্ববর্তী লিপিগুলোকেও অন্তর্ভুক্ত করে।

আব্বাসীয় যুগে প্রায় দেড় শতাব্দী ধরে কুফিক লিপির প্রাধান্য বজায় থাকে। এই সময়েই বাগদাদের প্রখ্যাত উজির ও ক্যালিগ্রাফার ইবনে মুকলা (মৃত্যু ৯৪০) জ্যামিতির ভিত্তিতে লিপির একটি সুসংগঠিত অনুপাত তত্ত্ব প্রণয়ন করেন। তিনি অক্ষর গঠনের জন্য বিন্দু, আলিফ এবং বৃত্তকে পরিমাপের মৌলিক একক হিসেবে প্রতিষ্ঠা করেন। এই কাঠামোর ভিত্তিতে তিনি ছয়টি লিপির–মুহাক্কাক, রাইহানি, থুলুথ, নাসখ, তাওকি এবং রিকা–নিয়মিত রূপ নির্ধারণ করেন, যা সম্মিলিতভাবে 'আকলাম-ই সিত্তে' বা 'ছয় কলম' নামে পরিচিত।

এক শতাব্দী পর বাগদাদে প্রশিক্ষিত ক্যালিগ্রাফার আলী ইবনে হিলাল (মৃত্যু ১০৩২) এই লিপিগুলোকে আরও সূক্ষ্ম ও পরিশীলিত রূপে উন্নীত করেন। এই শিল্পের বিবর্তন অব্যাহত থাকে এবং আব্বাসীয় খলিফা ও প্রধান ক্যালিগ্রাফার ইয়াকুত আল-মুস্তাসিমি (মৃত্যু ১২৯৮)-এর হাতে এটি নতুন মাত্রার স্বচ্ছতা, ভারসাম্য ও নান্দনিক উৎকর্ষ লাভ করে। তিনি পূর্ববর্তী নিয়মাবলিকে আরও সুসংহত ও নির্ভুলভাবে পুনর্বিন্যাস করেন।

১২৫৮ সালে বাগদাদের পতনের পর ক্যালিগ্রাফির নেতৃত্ব ধীরে ধীরে তুর্কি ও ইরানি ওস্তাদদের হাতে চলে যায়। ইরানি ক্যালিগ্রাফাররা ইয়াকুতের শৈলীর প্রতি অনুগত থেকে নিজেদের নান্দনিক রুচি অনুযায়ী 'আকলাম-ই সিত্তে'-কে ব্যাখ্যা করেন। অন্যদিকে উসমানীয় তুর্কিরা ক্যালিগ্রাফির এক স্বতন্ত্র ও পরিশীলিত ধারা প্রতিষ্ঠা করে।

ষোড়শ শতাব্দীতে উসমানীয় ক্যালিগ্রাফির জনক হিসেবে পরিচিত শেখ হামদুল্লাহ (মৃত্যু ১৫২০) 'ছয় কলম'-এ এক অসাধারণ নান্দনিক পরিপক্বতা নিয়ে আসেন। তাঁর হাত ধরেই থুলুথ ও নাসখ লিপি তুর্কি নান্দনিকতার সঙ্গে গভীরভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং কুরআন অনুলিপির ক্ষেত্রে নাসখ লিপি প্রধান মান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

শেখ হামদুল্লাহর প্রভাব এতটাই গভীর ছিল যে পরবর্তী ক্যালিগ্রাফারদের সাফল্য প্রায়ই তাঁর মানদণ্ডের সঙ্গে তুলনা করে বিচার করা হতো। উৎকৃ' ক্যালিগ্রাফারদের প্রশংসায় বলা হতো–'তিনি শেখের মতো লেখেন' বা 'দ্বিতীয় শেখ'–যা এক শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে একটি মানদণ্ড হিসেবে টিকে ছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে হাফিজ উসমান (মৃত্যু ১৬৯৮) শেখ হামদুল্লাহর ধারা পরিমার্জন করে একটি স্বতন্ত্র ব্যক্তিগত শৈলী গড়ে তোলেন, যা ক্যালিগ্রাফিতে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করে। পরবর্তীতে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইসমাইল জুহদু (মৃত্যু ১৮০৬) এবং তাঁর ভাই মুস্তফা রাকিম (মৃত্যু ১৮২৬) এই ধারাকে আরও বিকশিত করেন। বিশেষত মুস্তফা রাকিম থুলুথ, নাসখ এবং চেলি থুলুথে ক্যালিগ্রাফির শীর্ষস্থানীয় দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি রচনাগত বিন্যাসে (ইস্তিফ) অসাধারণ ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং ক্ষুদ্র থেকে বৃহৎ–সব আকারেই শৈলীর নিখুঁত প্রয়োগ ঘটান।

পরবর্তী সময়ে চেলি থুলুথের প্রখ্যাত ওস্তাদ সামি এফেন্দি (মৃত্যু ১৯১২) ইসমাইল জুহদুর শৈলীকে বৃহৎ আকারের শিলালিপিতে প্রয়োগ করে এই ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করেন।

উসমানীয় বিজয়ের পর ইস্তাম্বুল ক্যালিগ্রাফির অমর কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ইসলামী বিশ্বে বহুল প্রচলিত একটি উক্তি এই বাস্তবতাকে প্রকাশ করে: 'কুরআন হিজাজে অবতীর্ণ হয়েছে, মিশরে পঠিত হয়েছে এবং লিখিত ও পঠিত উভয়টি হয়েছে ইস্তাম্বুলে।'

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিক্ষার্থীরা এই শিল্প শেখার জন্য ইস্তাম্বুলে আগমন করতেন। উসমানীয় ক্যালিগ্রাফি বিদ্যালয়ের প্রখ্যাত ওস্তাদের মধ্যে রয়েছেন–শেখ হামদুল্লাহ, আহমেদ কারাহিসারি, হাফিজ উসমান, মুস্তফা রাকিম, মাহমুদ সেলেলেদ্দিন এফেন্দি এবং ইয়েসারিজাদে মুস্তফা ইজ্জেত এফেন্দি।

স্ক্রিপ্ট এবং শৈলী আকলাম-আই সিত্তে

আকলাম-আই সিত্তে ঐতিহ্যগতভাবে সাজানো হয় তিনটি জোড়া লিপি: থুলুথ-নাসখ, মুহাক্কাক-রাইহানি, এবং তাওকি-রিকা দিয়ে। প্রতিটি জোড়ার প্রথম লিপিটি সাধারণত প্রায় ২ মিমি নিব-প্রস্থের নলখাগড়ার কলমে বৃহৎ ও জাঁকজমকপূর্ণভাবে লেখা হয়, আর তার প্রতিরূপটি প্রায় ১ মিমি সূক্ষ্ম কলমে অপেক্ষাকৃত ছোট ও পরিশীলিত রূপে প্রকাশ পায়। অক্ষরগত দিক থেকে মুহাক্কাকের সঙ্গে রাইহানি এবং তাওকির সঙ্গে রিকা ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য বহন করে—যেন ভিন্ন বয়সের দুই সহোদর। তবে থুলুথ ও নাসখের মধ্যে পার্থক্য শুধু আকারে নয়, গঠনগত নান্দনিকতাতেও সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত।

মুহাক্কাক

'সুশৃঙ্খল' বা 'দৃঢ়' অর্থবাহী এই লিপি থুলুথের তুলনায় বৃহৎ ও অধিক বিস্তৃত অক্ষর বিন্যাসে গঠিত। সিন, ফা, কাফ ও নুন-এর মতো অক্ষরগুলোর উল্লম্ব রেখা এবং বামদিকে প্রসারিত অবতল আকৃতি এখানে আরও স্প' ও জোরালোভাবে প্রকাশ পায়। এর গঠন কৌণিক ও নিয়ন্ত্রিত; অতিরিক্ত বাঁক বা অলঙ্করণ পরিহার করে এটি সরলরেখা-নির্ভর নান্দনিকতাকে অনুসরণ করে। ফলস্বরূপ, এর স্বচ্ছতা ও ভারসাম্যপূর্ণ বিন্যাস এক ধরনের মর্যাদাপূর্ণ উন্মুক্ততা ও গাম্ভীর্য সৃষ্টি করে।

রাইহানি

রাইহানি মূলত মুহাক্কাকেরই একটি ক্ষুদ্রতর ও সূক্ষ্ম সংস্করণ, যা একই নীতিমালার অনুসরণে গঠিত হলেও আকারে অধিক সংযত ও কোমল। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত এই দুই লিপিই ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো, বিশেষত কুরআন পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে। তবে পরবর্তীকালে স্থান ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের পরিবর্তনের কারণে ধীরে ধীরে এদের ব্যবহার সীমিত হয়ে পড়ে এবং বহু অঞ্চলে প্রায় পরিত্যক্ত হয়ে যায়।

থুলুথ

মুহাক্কাকের তুলনায় সামান্য ছোট আকারে গঠিত থুলুথ লিপির বৈশিষ্ট্য এর খাটো ও গভীর বক্রতা এবং সামগ্রিকভাবে কোমল অথচ জাঁকজমকপূর্ণ চেহারা। এর নান্দনিক ভারসাম্য ও প্রবাহমানতা একে শিরোনাম, প্যানেল, স্থাপত্য অলংকরণ এবং ক্যালিগ্রাফিক রচনার জন্য বিশেষভাবে উপযোগী করে তুলেছে। আজও ইসলামি ক্যালিগ্রাফির অন্যতম সক্রিয় ও মর্যাদাপূর্ণ লিপি হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়।

নাসখ

'বাতিল করা' বা 'স্থানচ্যুত করা' অর্থবাহী নাসখ লিপি থুলুথেরই একটি ক্ষুদ্র ও অধিক কার্যকর রূপ। এর নামকরণের পেছনে ঐতিহাসিক কারণ হলো—বই অনুলিপির ক্ষেত্রে এর ব্যাপক ব্যবহার ধীরে ধীরে অন্যান্য লিপিকে প্রতিস্থাপিত করেছিল। এর স্পষ্টতা, পাঠযোগ্যতা এবং ভারসাম্যপূর্ণ গঠন একে পাণ্ডুলিপি রচনার জন্য আদর্শ লিপিতে পরিণত করেছে, যা আজও থুলুথের পাশাপাশি সমানভাবে ব্যবহৃত হয়।

তাওকি

থুলুথ থেকে উদ্ভূত হলেও তাওকি অপেক্ষাকৃত ছোট আকারে বিকশিত হয়েছে এবং এতে এমন অক্ষর সংযোগের

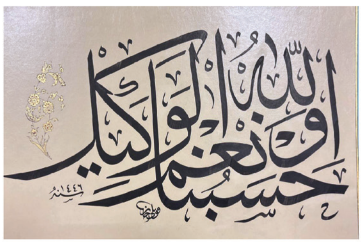

সক্ষমতা রয়েছে, যেগুলো সাধারণত অন্য লিপিতে যুক্ত হয় না। ঐতিহাসিকভাবে এটি খলিফা ও উজিরদের চিঠিপত্র এবং রাজকীয় ফরমানের সঙ্গে যুক্ত অনুমোদনপত্র (নিশান) রচনার জন্য ব্যবহৃত হতো। ওয়াকফ দলিলেও এর গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার ছিল।

রিকা

তাওকির ঘনিষ্ঠ ক্ষুদ্র রূপ হিসেবে রিকা লিপি আরও সংক্ষিপ্ত, দ্রুতলিখনযোগ্য এবং ব্যবহারিকভাবে অত্যন্ত কার্যকর। এর নামের অর্থ 'ছোট পাতা' বা 'ছোট অক্ষর', যা এর আকার ও প্রকৃতিকে যথাযথভাবে প্রতিফলিত করে। ওয়াকফ দলিলের পাশাপাশি এটি প্রায়শই কুরআন পাণ্ডুলিপির শেষ প্রার্থনা পাতায় ব্যবহৃত হতো, যেখানে ক্যালিগ্রাফার নিজের নাম, তারিখ এবং প্রার্থনা লিপিবদ্ধ করতেন।

আকলাম-ই সিত্তার এই শাস্ত্রীয় কাঠামোর পাশাপাশি তালিক, দিভানি, জালি দিভানি এবং রিকার মতো লিপিগুলো স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত হয়ে বিশেষ ঐতিহাসিক ও প্রশাসনিক গুরুত্ব অর্জন করেছে। বিশেষত অটোমান ক্যালিগ্রাফিতে রিকার একটি রূপান্তর–অটোমান রিকা–উদ্ভব ঘটে, যা দিভানি লিপির সরলীকরণের মাধ্যমে গঠিত হয়। এতে উল্লম্ব রেখা সংক্ষিপ্ত করা হয়, বক্রতা হ্রাস করা হয় এবং লিপিকে অধিক সংযত ও ব্যবহারবান্ধব রূপ দেওয়া হয়।

রাজপ্রাসাদের চিঠিপত্র ও দৈনন্দিন প্রশাসনিক যোগাযোগে ব্যবহৃত এই লিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরুতে আত্মপ্রকাশ করে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাবিয়ালি পরিবেশে পূর্ণতা লাভ করে। এই উন্নত রূপটি 'বাবিয়ালি রিকা' বা 'মুমতাজ এফেন্দি রিকা' নামে পরিচিত হয়। পরবর্তীকালে মেহমেত ইজ্জেত এফেন্দি (মৃত্যু ১৯০৩) এর সংস্কারকৃত সংস্করণ তার স্মারক ও নান্দনিক বৈশিষ্ট্যের কারণে আরব বিশ্বেও বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

তালিক

চতুর্দশ শতাব্দীতে ইরানে তাওকির রূপান্তর হিসেবে তালিক লিপির উদ্ভব ঘটে এবং এটি মূলত দাপ্তরিক চিঠিপত্রে ব্যবহৃত হতো। এর নামের অর্থ 'ঝুলন্ত', যা অক্ষরগুলোর পারস্পরিক সংযোগ ও ঝুলে থাকার ভিজ্যুয়াল গঠনকে নির্দেশ করে। তালিক লিপির অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো এর অনুপাতিক ভারসাম্য, ছন্দময় প্রবাহ এবং সুরেলা রেখা-সংগঠন, যা একে নান্দনিকভাবে অত্যন্ত আকর্ষণীয় করে তোলে।

এর দু'টি প্রধান শৈলী বিকশিত হয়–ইরানি ও অটোমান। যদিও প্রথমদিকে অটোমান ক্যালিগ্রাফাররা ইরানি ধারা অনুসরণ করলেও, পরবর্তীতে তারা নিজেদের স্বতন্ত্র শৈল্পিক রূপ প্রতিষ্ঠা করেন। ইয়াসারি এবং পরবর্তীতে ইয়াসারিজাদে মুস্তফা ইজ্জেতের প্রচেষ্টায় একটি পরিশীলিত অটোমান তালিক শৈলীর বিকাশ ঘটে। এটি থুলুথের জাঁকজমকের বিপরীতে অধিক সূক্ষ্ম, বক্র ও সুরেলা রূপ ধারণ করে।

এর পরিমার্জিত রূপ–হুরদে ও হাফি–সাহিত্যিক গ্রন্থ ও কাব্য সংকলনে ব্যবহৃত হতো এবং এটি ফতোয়া সংক্রান্ত দফতরের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক লিপিতে পরিণত হয়। (রা.)

দিভানি

পঞ্চদশ শতাব্দীতে আক-কোয়ুনলু রাজ্যের মাধ্যমে অটোমান প্রশাসনে তালিক লিপি প্রবেশ করে এবং দ্রুত রূপান্তরের মাধ্যমে রাজকীয় চ্যান্সারিতে ব্যবহারের উপযোগী হয়ে ওঠে। এই প্রশাসনিক ব্যবহারের কারণেই এর নাম হয় 'দিভানি'। এর জটিল ও অলংকৃত রূপ–জালি দিভানি–উচ্চপর্যায়ের রাষ্ট্রীয় চিঠিপত্রে ব্যবহৃত হতো।

উভয় লিপিই অটোমান ক্যালিগ্রাফির স্বতন্ত্র উদ্ভাবনের প্রতিনিধিত্ব করে, যেখানে সৌন্দর্য, ক্ষমতা এবং প্রশাসনিক কার্যকারিতা একত্রে মিলিত হয়েছে। ■

ফিলিস্তিন ও আমাদের করণীয়

এম. আদনান আল-হাজ্জ শাকের
পরিচালক, পাইওনিয়ার্স একাডেমি ফর জেরুজালেম স্টাডিজ, ইস্তাম্বুল। প্রতিষ্ঠাতা, ইঞ্জিনিয়ার্স ফর জেরুজালেম অ্যাসোসিয়েশন, সিরিয়া, তুরস্ক

আল্লাহ তাআলা ইরশাদ করেন:

"মুমিনদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর সাথে করা অঙ্গীকারে বিশ্বস্ত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তাদের অঙ্গীকার পূর্ণ করেছে, কেউ কেউ এখনো অপেক্ষায় আছে; তারা তাদের আদর্শে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন আনেনি।" (আল-আহযাব: ২৩)

অস্তিত্ব রক্ষার চরম সংকট

ফিলিস্তিন ইস্যু আজ তার ইতিহাসের সবচেয়ে বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণ অতিক্রম করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ইহুদিবাদী ও পশ্চিমা ঔদ্ধত্য আজ চরমে। নির্বিচারে হত্যা, গণ-বাস্তুচ্যুতি, হাসপাতাল ও বেসামরিক অবকাঠামো ধ্বংস এবং অমানবিক অর্থনৈতিক অবরোধ এক বিভীষিকাময় রূপ নিয়েছে। প্রতিদিন আমাদের চোখের সামনেই শিশু, নারী ও বৃদ্ধসহ হাজার হাজার নিরপরাধ ফিলিস্তিনি শহীদ হচ্ছেন–ইতিমধ্যেই এই সংখ্যা ৭২,০০০ ছাড়িয়েছে।

> “একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি অবিচার করে না এবং তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আর যে কোনো মুসলমানের কষ্ট লাঘব করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট লাঘব করবেন।”
> (সহীহ মুসলিম)

জায়নবাদী অপশক্তি ফিলিস্তিনিদের অধিকার চিরতরে নিশ্চিহ্ন করার জন্য এক সুদূরপ্রসারী ও নিখুঁত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

গাজায় নজিরবিহীন ধ্বংসযজ্ঞ

মাত্র ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার আয়তনের গাজা উপত্যকায় এখন পর্যন্ত ২,০০,০০০ টনেরও বেশি বিস্ফোরক, বোমা ও শক্তিশালী ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করা হয়েছে। এই ধ্বংসলীলা আধুনিক ইতিহাসের যেকোনো যুদ্ধকে হার মানায়। গাজার দুই-তৃতীয়াংশ ঘরবাড়ি এখন ধ্বংসস্তূপ। বিদ্যুৎ, পানি, পয়ঃনিষ্কাশন ও যোগাযোগ ব্যবস্থাসহ সামগ্রিক অবকাঠামোকে মাটির সাথে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, হাসপাতাল এবং এমনকি আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থা ও জাতিসঙ্ঘের ভবনগুলোকেও রেহাই দেওয়া হয়নি। এটি নিছক যুদ্ধ নয়, বরং একটি পরিকল্পিত জাতিগত নির্মূল অভিযান–যার নীরব সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে পুরো বিশ্ব।

মুসলিম উম্মাহর দায়বদ্ধতা

একদল জায়নবাদী নিয়মিত পবিত্র আল-আকসা মসজিদকে অপবিত্র করছে, মুসলমানদের লাঞ্ছিত করছে–অথচ গোটা মুসলিম বিশ্ব আজ নির্বিকার। অথচ নবী করীম (সা.) ইরশাদ করেছেন:

“একজন মুসলমান আরেকজন মুসলমানের ভাই। সে তার প্রতি অবিচার করে না এবং তাকে শত্রুর হাতে তুলে দেয় না। যে তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণ করে, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করেন। আর যে কোনো মুসলমানের কষ্ট লাঘব করে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার কষ্ট লাঘব করবেন।” (সহীহ মুসলিম)

গাজা ও পশ্চিম তীরে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে বন্দী করে অবর্ণনীয় নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ও তথাকথিত মানবাধিকার সংস্থাগুলো এই অমানবিক আচরণের বিরুদ্ধে নিশ্চুপ, অথচ তারা দখলদার বাহিনীর গুটিকয়েক যুদ্ধবন্দী সেনার মুক্তি নিয়ে সোচ্চার। তারা বিস্মৃত হয়েছে যে, দখলদারিত্বই হলো সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে নিকৃষ্ট রূপ এবং এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ করা ফিলিস্তিনিদের আইনগত ও নৈতিক অধিকার।

জেরুজালেম ও আল-আকসার বর্তমান হুমকি

কেবল গাজা নয়, পশ্চিম তীরও আজ দখলদারদের নির্মম থাবায় বিধ্বস্ত। আমাদের পবিত্র জেরুজালেম শহরকে ‘ইহুদিকরণ’-এর নীল নকশা চলছে। মুসলমানদের প্রথম কিবলা এবং বরকতময় আল-আকসা মসজিদ আজ ধ্বংসের হুমকির মুখে। গত ৩০ বছরের তথাকথিত ‘শান্তি আলোচনা’ বা ‘অসলো চুক্তি’ ফিলিস্তিনিদের জন্য বসতি স্থাপন ও ভূমি দখল বৃদ্ধি ছাড়া আর কিছুই বয়ে আনেনি। ফিলিস্তিন কোনো আঞ্চলিক বিষয় নয়, বরং এটি সমগ্র আরব ও ইসলামি বিশ্বের পবিত্র ভূমি। এর ওপর আগ্রাসন মানেই হলো গোটা উম্মাহর ওপর আঘাত।

আমাদের আশু কর্তব্য

ফিলিস্তিনিদের বস্তুগত ও নৈতিক সমর্থন দেওয়া আজ প্রতিটি মুসলমানের ওপর অর্পিত পবিত্র দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পালনে অবহেলা করা বা তাদেরকে অনাহারে মরতে দেওয়া একটি জঘন্যতম পাপ। এ বিষয়ে আমাদের করণীয়সমূহ:

১. সর্বাত্মক সমর্থন: রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সংবাদমাধ্যমসহ সকল উপায়ে ফিলিস্তিনের পক্ষে জনমত গঠন ও ত্রাণ সহায়তা নিশ্চিত করা।

২. মানসিক সংহতি: মুমিনরা এক দেহের মতো। ফিলিস্তিনের ব্যথায় ব্যথিত হওয়া এবং তাদের জন্য আন্তরিকভাবে দোয়া করা আমাদের ঈমানি দায়িত্বের সর্বনিম্ন স্তর।

৩. সচেতনতা বৃদ্ধি: দখলদারদের অপপ্রচার রুখে দিয়ে ফিলিস্তিনিদের ন্যায়সঙ্গত অধিকারের কথা বিশ্বমঞ্চে ও নিজ নিজ আঙিনায় প্রচার করা।

৪. অর্থনৈতিক বয়কট: জায়নবাদী শত্রুদের সমর্থনকারী ও অর্থায়নকারী সকল প্রতিষ্ঠানের পণ্য বর্জন করা এবং দখলদারদের সাথে যেকোনো ধরণের ‘স্বাভাবিকীকরণ’ বা রাজনৈতিক সখ্যতার প্রতিবাদ জানানো।

শেষ কথা

নবী মুহাম্মদ (সা.) যে সাতটি কাজের আদেশ দিয়েছিলেন, তার মধ্যে অন্যতম হলো–“নিপীড়িতকে সমর্থন করা।” ফিলিস্তিনিরা আজ সেই নিপীড়নের চরম সীমায় দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে তাকিয়ে আছে।

আসুন আমরা মহান আল্লাহর কাছে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, যেন তিনি অদূর ভবিষ্যতে আমাদের বিজয়ী ও মুক্তিদাতা হিসেবে পবিত্র আল-আকসা মসজিদে সিজদা করার তৌফিক দান করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহর সাহায্য অতি নিকটবর্তী। ■

মতবিরোধ থেকে ঐক্যে: বাংলাদেশে ধর্মীয় উত্তেজনা নিরসনের একটি রূপকল্প

আহমেদ শাওকী আফিফি
সভাপতি, আরবি ভাষা একাডেমি, বাংলাদেশ

বাংলাদেশের ধর্মীয় পরিমণ্ডল বৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ মোজাইক। এখানে ইসলামী আইনশাস্ত্রের (ফিকহ) একাধিক ধারা, ভিন্ন ভিন্ন মতাদর্শগত প্রবণতা, আধ্যাত্মিক পথ ও প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় অভিজ্ঞতা দীর্ঘকাল ধরে সহাবস্থান করছে। ঐতিহাসিকভাবে এই বৈচিত্র্য ছিল বুদ্ধিবৃত্তিক প্রাণশক্তি ও ধর্মীয় সমৃদ্ধির বহিঃপ্রকাশ। তবে সময়ের বিবর্তনে এবং সামাজিক রূপান্তরের ধারায় এই বৈচিত্র্য আজ এক জটিল ও বহুমাত্রিক সজ্ঞাতের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। এই বিভেদ এখন কেবল দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য নয়, বরং তা সমাজের নৈতিক কাঠামো, পারস্পরিক বিশ্বাস এবং জাতীয় সংহতির মূলে আঘাত করছে।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও মতভেদের রূপান্তর

ইসলামী চিন্তাধারার ইতিহাসে মতভেদকে (ইখতিলাফ) একটি বৈধ ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। জ্ঞানের মূলনীতি এবং বিতর্কের উচ্চতর নৈতিকতা দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়েই বিভিন্ন ফিকহী মাযহাব ও

ধর্মতাত্ত্বিক দর্শনের বিকাশ ঘটেছিল। সেই যুগে ভিন্নমত ছিল অনুসন্ধিৎসু ও সমন্বয়ের চেতনায় পুষ্ট। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ঔপনিবেশিক অভিজ্ঞতা, উপমহাদেশের রাজনৈতিক বিভাজন এবং আধুনিক রাষ্ট্র গঠনের প্রক্রিয়া এই বুদ্ধিবৃত্তিক ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ক্ষুণ্ন করেছে। ফলে মতবিরোধ আজ বুদ্ধিবৃত্তিক আলোচনার টেবিল থেকে সরে এসে আত্মপরিচয়ের সংঘাত, প্রভাব বিস্তারের প্রতিযোগিতা এবং সামাজিক আধিপত্যের ময়দানে স্থানান্তরিত হয়েছে।

ধর্মীয় সংঘাতের কাঠামোগত কারণসমূহ

বাংলাদেশের ধর্মীয় উত্তেজনার মূলে রয়েছে গভীর ও জটিল কিছু কাঠামোগত কারণ:

১. ধর্ম ও রাজনীতির সংমিশ্রণ: ধর্মীয় বিশ্বাস ও পরিচয় যখন রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাতিয়ার হয়, তখন বিতর্ক আর যুক্তির সীমায় থাকে না। এটি তখন ক্ষমতার লড়াইয়ে রূপ নেয়, যেখানে সাম্প্রদায়িক বিভেদ ও মেরুকরণকে ব্যবহার করে জনতাকে সংগঠিত করার চেষ্টা করা হয়।

২. শিক্ষা ব্যবস্থার খণ্ডীকরণ: ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় আধুনিকতা ও ঐতিহ্যের ভারসাম্যের অভাব এবং পাঠ্যক্রমের একমুখিতা একটি অনমনীয় চেতনার জন্ম দিচ্ছে। এটি বহুত্ববাদকে গ্রহণ করার ক্ষমতা কমিয়ে দিচ্ছে এবং ভিন্নমতকে পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা হিসেবে দেখার পরিবর্তে 'বিচ্যুতি' হিসেবে দেখার প্রবণতা তৈরি করছে।

৩. কর্তৃত্বের লড়াই ও প্রতীকী সহিংসতা: সত্যের একচেটিয়া দাবিদার হওয়ার প্রতিযোগিতা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতি জনগণের আস্থা কমিয়ে দিচ্ছে। এর সবচেয়ে বিপজ্জনক দিক হলো ভাষাগত সহিংসতা। ভিন্নমতালম্বীকে 'কাফির', 'ধর্মদ্রোহী' বা 'বিদআতি' আখ্যা দেওয়া এখন সাধারণ ঘটনায় পরিণত হয়েছে, যা সহাবস্থানের নৈতিক ভিত্তিকেই ধ্বংস করে দিচ্ছে।

৪. ডিজিটাল মাধ্যমের নেতিবাচক প্রভাব: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম যাচাইবিহীন ও উসকানিমূলক বক্তব্য দ্রুত ছড়িয়ে দিচ্ছে। ফলে তাত্ত্বিক বিতর্কগুলো এখন ডিজিটাল উত্তেজনার মাধ্যমে সামাজিক বাস্তবতায় প্রতিফলিত হয়ে বিভাজনকে আরও উসকে দিচ্ছে।

গভীর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

ধর্মীয় বিবাদের এই বিষবাষ্প সমাজের গভীরতম স্তরে প্রবেশ করেছে। ব্যক্তি এখন তার সংকীর্ণ মতাদর্শিক বৃত্তে আটকা পড়ছে; যেখানে সংলাপের পরিবর্তে আত্মরক্ষা ও বিচ্ছিন্নতাই প্রধান হয়ে দাঁড়িয়েছে। এর ফলে পারিবারিক ও সামাজিক বন্ধন শিথিল হচ্ছে এবং পারস্পরিক সন্দেহের সংস্কৃতি গড়ে উঠছে।

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হলো তরুণ প্রজন্মের অবস্থান। পরস্পরবিরোধী ফতোয়া ও উসকানিমূলক বক্তব্যের ভিড়ে অনেকেই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ছে। এর ফলে সমাজে দু'টি বিপরীতমুখী স্রোত তৈরি হচ্ছে: একদল ধর্মের প্রতি আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে, আর অন্যদল উগ্রপন্থা ও অন্ধ কঠোরতার দিকে ঝুঁকে পড়ছে। ধর্মীয় নেতাদের এই পারস্পরিক কাদা-ছোড়াছুড়ি শেষ পর্যন্ত খোদ ধর্মীয় নিশ্চয়তা ও প্রশান্তির পরিবেশকেই নষ্ট করে দিচ্ছে।

বিভেদ নিরসন ও উত্তরণের পথ

বাংলাদেশের ধর্মীয় সংহতি ফিরিয়ে আনতে প্রজ্ঞা ও দূরদর্শিতার ওপর ভিত্তি করে একটি পূর্ণাঙ্গ পদক্ষেপ প্রয়োজন:

বিভেদের আইনশাস্ত্র (ফিকহুল ইখতিলাফ) প্রতিষ্ঠা: বৈচিত্র্যকে স্বীকার করে এবং ব্যক্তিগত আক্রমণ ও 'তাকফির' (ধর্মচ্যুতকরণ) সংস্কৃতির অবসান ঘটিয়ে একটি মার্জিত আলোচনার কাঠামো তৈরি করতে হবে।

সম্মিলিত জাতীয় প্ল্যাটফর্ম: দেশের সকল ঘরানার আলেম ও চিন্তাবিদদের নিয়ে একটি জাতীয় কাউন্সিল গঠন করা উচিত, যা জাতীয় সংকটে অভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করবে এবং সঠিক ধর্মীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করবে।

আলোচনার ভাষা পরিমার্জন: ধর্মীয় উপদেশে বর্জনমূলক বা উসকানিমূলক ভাষা পরিহার করে দয়া, ঐক্য ও সম্প্রীতির ওপর জোর দিতে হবে।

শিক্ষায় সহনশীলতা: ধর্মীয় ও সাধারণ–উভয় শিক্ষা ব্যবস্থায় ভিন্নমতের শিষ্টাচার ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার সংস্কৃতি অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

ডিজিটাল নৈতিকতা: সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহারে নৈতিক দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা এবং অনিয়ন্ত্রিত ফতোয়া প্রচার রোধে আলেম সমাজ ও রাষ্ট্রকে সমন্বিত ভূমিকা পালন করতে হবে।

স্থানীয় মধ্যস্থতা কমিটি: তৃণমূল পর্যায়ে বিবাদ নিরসনে বিশ্বস্ত আলেম ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদের নিয়ে 'মধ্যস্থতা কমিটি' গঠন করা যেতে পারে, যা উত্তেজনাকে প্রকাশ্য সংঘাতে রূপ নিতে বাধা দেবে।

উপসংহার

বাংলাদেশের ধর্মীয় বিভেদ কোনো ক্ষণস্থায়ী ঘটনা নয়, বরং এটি এক দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও কাঠামোগত মিথস্ক্রিয়ার ফল। এই সংঘাত নিরসনে কেবল আবেগ নয়, বরং প্রাজ্ঞ ও বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ প্রয়োজন। ঐক্য ও সহাবস্থানের দর্শন ছড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে আমরা যদি আমাদের জাতীয় স্মৃতি ও সম্প্রীতির ঐতিহ্যকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারি, তবেই বাংলাদেশ ধর্মীয় সৌহার্দ্য ও সামাজিক সংহতির এক অনন্য মরূদ্যান হিসেবে টিকে থাকবে। ■